উন্নয়নে জনঅংশগ্রহণ
জনস্বার্থে উন্নয়ন

জাতীয় পরিকল্পনা ও বাজেট সম্পর্কিত
সংসদীয় ককাস
PARLIAMENTARY CAUCUS
ON NATIONAL PLANNING AND BUDGET

CENTRE ON BUDGET AND POLICY
UNIVERSITY OF DHAKA

গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলন
Democratic Budget Movement

উন্নয়নে জনঅংশগ্রহণ
জনস্বার্থে উন্নয়ন

জাতীয় পরিকল্পনা ও বাজেট সম্পর্কিত
সংসদীয় ককাস
PARLIAMENTARY CAUCUS
ON NATIONAL PLANNING AND BUDGET

CENTRE ON BUDGET AND POLICY
UNIVERSITY OF DHAKA

গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলন
Democratic Budget Movement

মে ২০১৮, ঢাকা

প্রকাশনা
গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলন
জাতীয় পরিকল্পনা ও বাজেট বিষয়ক সংসদীয় ককাস
সেন্টার অন বাজেট এন্ড পলিসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনা
ড. প্রতিমা পাল মজুমদার
মনোয়ার মোস্তফা
ড. কাজী মারুফুল ইসলাম
আসগর আলী সাবরী
ড. আফরোজা আখতার
মোহাম্মদ শহিদ উল্লাহ্
নুরুল আলম মাসুদ
এ. আর. আমান
সেকেন্দার আলী মিনা
মোসফিকুর রহমান
লায়লা তাসমিয়া

রচনা ও গবেষণা
শিক্ষা: জিসান আরা মিতু ও ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
স্বাস্থ্য: নির্মল দাস
কৃষি: নুরুল আলম মাসুদ
শ্রম ও কর্মসংস্থান: মোহাম্মাদ মারুফ হোসাইন
স্থানীয় সরকার: অনিরুদ্ধ রায়
জেন্ডার: লায়লা তাসমিয়া
আদিবাসী: সোহেল চন্দ্র হাজং ও খোকন সুইটেন মুরমু
প্রতিবন্ধী: আলবার্ট মোল্লা

প্রকাশনা সহযোগী: একশনএইড বাংলাদেশ

নকশা ও মুদ্রণ: অর্ক

যোগাযোগ
গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলন
বাড়ি # ৫৬০ (৪র্থ তলা), রোড # ০৮, আদাবর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
ই-মেইল: democratic.budget@gmail.com, ওয়েব: www.democraticbudget.org

নিঃস্বত্ত্ব
জনসচেতনতামূলক কাজে এই প্রকাশনার সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ প্রকাশকের অনুমতি ছাড়াই পুনঃমুদ্রণ বা অনুলিপি করা যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে সূত্র উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ রইলো। এই প্রকাশনার অবাণিজ্যিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

ভূমিকা

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ হিসাবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে এবং 'উন্নয়নশীল' দেশ হিসেবে শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। এ বাস্তবতা আমাদের দেশের জন্য একদিকে সুযোগ অন্যদিকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো সার্বজনীন প্রবৃদ্ধি অর্জনে কৌশল নির্ধারণ এবং ক্রমবর্ধমান বৈষম্য হ্রাসে যথাযথ রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ নিশ্চিত করা। বরাবরের মতো প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থানসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও অন্যান্য গ্রামীণ ও নগর পরিসেবায় বাজেট বৃদ্ধি এবারো অন্যতম বাজেট এজেন্ডা হিসেবে আলোচিত। জাতীয় নির্বাচনের বছর হওয়ায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য ও গুনগত মান নাগরিক সমাজের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

উল্লেখ্য প্রতিবছর জাতীয় বাজেটের আকার আনুক্রমিক হারে বড় হচ্ছে। কিন্তু ব্যয়ের গুণগত মান ও বাজেট বাস্তবায়নের দক্ষতার অভাব এখনো একটা বড় সমস্যা। পাশাপাশি ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্পে অগ্রাধিকারের ফলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষিসহ মৌলিক সেবাখাতের বাজেট আরো সংকুচিত হবে, নাকি এসব খাতে নতুন অর্থায়ন হবে সে বিষয়টি আলোচনার দাবি রাখে। এদিকে জেলা পরিষদসহ বিভিন্ন স্তরে নির্বাচিত স্থানীয় সরকার থাকার পরও স্থানীয় সরকারে আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এখনো সীমিত কিছু প্রকল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অথচ বাজেট বিকেন্দ্রীকরণের মধ্যদিয়ে স্থানীয় সরকারের কাছে আরো বেশি কিছু দায়িত্ব অর্পণ করা গেলে জাতীয় বাজেটের গুণগত মান পাবে নিঃসন্দেহে।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শ্রম ও কর্মসংস্থান, নারী, দলিত, আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন বাজেটসহ জাতীয় পরিকল্পনায় অংশভাগিদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও বাজেটের বিকেন্দ্রীকরণ কাঠামো এবং এ বিষয়ে জাতীয় সংসদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালনের বিষয়গুলি বিস্তারিত পরিসরে আলোচনায় আসা দরকার। সে লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলন, জাতীয় পরিকল্পনা ও বাজেট সম্পর্কিত সংসদীয় ককাস এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার অন বাজেট এন্ড পলিসি যৌথভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল, পেশা ও বৈশিষ্ট্যের মানুষের অংশগ্রহণে ৪র্থ বারের মতো 'জন-বাজেট সংসদ' আয়োজন করছে।

জনবাজেট সংসদ সামনে রেখে জাতীয় বাজেটে সরকার অত্যাবশ্যকীয় সেবাখাতগুলোকে কীভাবে দেখে, জনগণের জীবনমান পরিবর্তন ও দারিদ্র্য বিমোচনে কী ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করছে তা নিরীক্ষা ও জনপ্রস্তাবনাসমূহ নীতি নির্ধারকদের সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যে খাতভিত্তিক বাজেট বিশ্লেষণসমূহ এই পুস্তিকায় তুলে ধরা হলো।

আশা করছি, প্রকাশনার বিশ্লেষণপত্র এবং প্রস্তাবনাগুলো আগামি সময়ে জনঅংশগ্রহণমূলক বাজেট প্রণয়ন ও ন্যায্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে ভূমিকা রাখবে।

সূচিপত্র

জাতীয় বাজেট ২০১৭-১৮ ও স্বাস্থ্যখাত	৫
বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ	৭
বাজেটে কৃষির অগ্রাধিকার ও খাদ্য নিরাপত্তা	৯
শ্রম ও কর্মসংস্থান বাজেট	১২
স্থানীয় সরকারে অর্থায়ন ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ	১৫
জেন্ডার বাজেট	১৮
বাংলাদেশে দলিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও জাতীয় বাজেট	২০
জাতীয় বাজেট হোক আদিবাসীবান্ধব: আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রস্তাবনা ও সুপারিশ	২৩
প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অন্তর্ভুক্তিমূলক জাতীয় বাজেট ২০১৮-১৯	২৭

জাতীয় বাজেট ২০১৭–১৮ ও স্বাস্থ্যখাত

২০১১ সালে অনুষ্ঠিত ৬৪তম বিশ্ব স্বাস্থ্য এসেম্বলিতে ২০৩২ সালের মধ্যে সার্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে বাংলাদেশ অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। এছাড়া জাতিসংঘ গৃহীত স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ৩য় লক্ষ্যে সকল বয়সের মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার কথা বলা হলেও বাংলাদেশের স্বাস্থ্যবাজেট জনগণের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি ও জন–চাহিদার আলোকে প্রণীত হয় না। বাংলাদেশে একদিকে রোগ নিরাময়ে ব্যক্তিগত ব্যয়ের হার বাড়ছে, অন্যদিকে বদলে যাচ্ছে রোগের ধরণ। দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অসংক্রামক রোগে মৃত্যুর হার দ্রুত গতিতে বাড়ছে। ১৯৮৬ সালে অসংক্রামক রোগে মৃত্যুর হার ছিল ৮%; বর্তমানে এ হার ৬৭%। দেশের অধিকাংশ জনগণ এখনো মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা অর্জন থেকে বঞ্চিত। বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবায় সরকারি বরাদ্দের ঘাটতি, ব্যক্তি পর্যায়ে অত্যধিক ব্যয়, সুশাসনের অভাব, স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিতে গ্রাম–শহর, ধনী–দরিদ্র অসম সুযোগ ও বঞ্চনা সকলের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। এর সাথে রয়েছে স্বাস্থ্যসেবায় জনবল সংকট ও এর বিন্যাসে আঞ্চলিক বৈষম্য; রয়েছে অবকাঠামো, আধুনিক যন্ত্রপাতি, জবাবদিহিতা ও ব্যবস্থাপনার সংকট।

বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ব্যয়ের হালচিত্র – মোট স্বাস্থ্য ব্যয়ে সরকারি ও ব্যক্তিগত অংশ

এশিয়ার কয়েকটি দেশের সাথে তুলনায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশে স্বাস্থ্য খাতে রোগীর নিজস্ব অর্থ ব্যয় সবচেয়ে বেশি (৬৩.৩%) এবং এ ব্যয় ক্রমেই বাড়ছে। এ হার ভারতে ৫৭.৩% এবং নেপালে ৪৯.২%। বর্তমানে দেশের মোট স্বাস্থ্য ব্যয়ের মাত্র ২৩.৭% শতাংশ বহন করে সরকার; ১৯৯৭ সালে সরকারের অংশ ছিল ৩৭ শতাংশ। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে বাংলাদেশে মাথাপিছু স্বাস্থ্য ব্যয় (সরকারি, বেসরকারি এবং ব্যক্তিগত) সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে, ২৭ ইউএস ডলার, যেখানে ভারতে ৬১ ইউএস ডলার এবং মালয়েশিয়ায় ৪১০ ইউএস ডলার[১]। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নের জন্য এই খাতে ব্যয় ৪০ মার্কিন ডলার হওয়া আবশ্যক।

লেখচিত্র ১: মোট চিকিৎসা ব্যয়ের বিভিন্ন অংশ

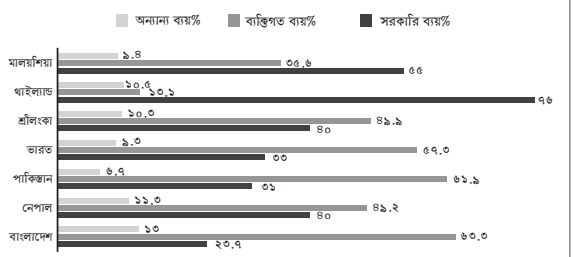

সূত্র: Bangladesh National Health Accounts 1997-2012, Ministry of Health and Family Welfare, Gov. of Bangladesh

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যানুযায়ী দৈনিক আয় যাদের ৩ দশমিক ১ ডলার, অতিরিক্ত স্বাস্থ্য ব্যয়ের কারণে দারিদ্র্যের কবলে পড়ছে তাদের ৪ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ। দীর্ঘমেয়াদি ও ব্যয়বহুল অসংক্রামক রোগের বিস্তৃতি বাড়ায় ও চিকিৎসায় ব্যক্তিগত বয়ের উচ্চহারের কারণে প্রতিবছর প্রায় অর্ধকোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ব্যয় বৃদ্ধির কারণ হচ্ছে ঔষুধ ক্রয়ে রোগিদের অনেক বেশি (৬৫%) অর্থ ব্যয় করতে হয়। এরপর রয়েছে হাসপাতালের বাইরে এবং ভেতরে চিকিৎসা সেবার জন্য যথাক্রমে ১১.৯% ও ১০.৮% অর্থ ব্যয় করেন। ট্রাডিশনাল বা অল্টারনেটিভ চিকিৎসা সেবায় ব্যয় হয় ৩.৮% অর্থ। ঔষুধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অভিযোগ রয়েছে চিকিৎসকরা অপ্রয়োজনীয়, মানহীন ঔষুধ রোগীদের প্রেসক্রাইভ করেন। মানহীন, ভেজাল ঔষুধ নিয়ন্ত্রণে সরকারের নজরদারীর ঘাটতি রয়েছে।

স্বাস্থ্য খাতে রুগ্ন বাজেট

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, একটি মানসম্মত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা চালাতে হলে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ জিডিপি'র ৫ শতাংশ হওয়া উচিত। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেছে ২০০৯ সালে, ক্ষমতায় আসার পর ২০০৯–১০ সালে যে বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছিল তাতে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ ছিল মোট বাজেটের ৬.২ শতাংশ এবং জিডিপির ০.৭৯ শতাংশ আর সেখানে সর্বশেষ ২০১৭–১৮ বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ

১ Bangladesh National Health Accounts 1997-2012, Ministry of Health and Family Welfare, Government of Bangladesh

ছিল ৫.২ শতাংশ, যা জিডিপি'র ০.৯২%। আমরা ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় প্রবেশ করছি। মানব সম্পদ উন্নয়নে আমাদের স্বাস্থ্যখাতে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়ের প্রাক্কলন ছিল জিডিপি'র ১.২%; কিন্তু আমাদের জাতীয় বাজেটে এ বরাদ্দ কখনো জিডিপি'র ১% পর্যন্ত পৌঁছেনি।

লেখচিত্র ২: চিকিৎসা ক্ষেত্রে রোগিদেও ব্যক্তিগত ব্যয়ের খাতসমূহ

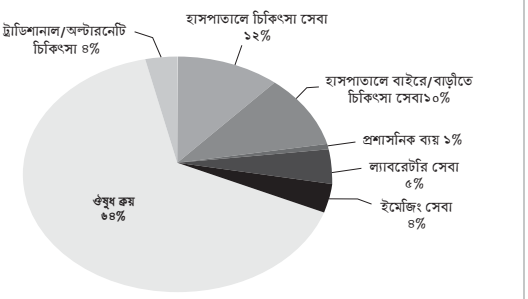

সূত্র: Bangladesh National Health Accounts 1997-2012, Ministry of Health and Family Welfare, Gov. of Bangladesh

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যয়ে আঞ্চলিক বৈষম্য, জনবল সংকট ও অসমতা

বাংলাদেশে একদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মাপকাঠি অনুযায়ী একদিকে জনসংখ্যা অনুপাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবলের অভাব রয়েছে অপরদিকে এ জনবলের মধ্যে রয়েছে আনুপাতিকভাবে ভারসাম্যের অভাব; রয়েছে অদক্ষতা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে প্রতি ১০,০০০ জনে স্বাস্থ্যকর্মী থাকা প্রয়োজন কমপক্ষে ২৩ জন, বাংলাদেশে সেখানে রয়েছে মাত্র ৫.৮ জন। যেখানে চিকিৎসক নার্সের অনুপাত হবে ১:৩; বাংলাদেশে চিকিৎসক নার্সের অনুপাতিক হার ০.৬। যুক্তরাজ্য থেকে প্রকাশিত চিকিৎসা সাময়িকী ল্যানসেটের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবাদানকারীদের ৯৪% অদক্ষ। চিকিৎসক তৈরির সব প্রতিষ্ঠান মানসম্মত নয়। সেই সাথে রয়েছে সরকারি হাসপাতালগুলোতে শূন্য পদ পূরণে বিলম্ব ও এর বিন্যাসে বৈষম্য। অপরদিকে স্বাস্থ্যখাতে সরকারি বরাদ্দে যেসকল জেলাসমূহে দারিদ্র্যের মাত্রা বেশি সেসব জেলা স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দের এখনো পিছিয়ে আছে। যেসব জেলায় ধনী মানুষের বসতি বেশি সেসব জেলায় সরকারি ব্যয়ও বেশি। মোট স্বাস্থ্য বাজেটের ৪১ শতাংশ ব্যয় হয় ঢাকা জেলায় এবং চট্টগ্রাম জেলায় ব্যয় ১৮ শতাংশ। সবচেয়ে কম ব্যয় হয় সিলেট ও বরিশাল বিভাগে মাত্র ৪ ও ৫ শতাংশ যথাক্রমে[২]। এটি একদিকে যেমন দুর্বল সরকারি ব্যবস্থাপনাকে নির্দেশ করে অন্যদিকে স্বাস্থ্যখাতে দুর্নীতির চিত্রকেও তুলে ধরে।

প্রস্তাবনা

- বাংলাদেশে স্বাস্থ্যখাতে বাজেট প্রণয়নে কেন্দ্রীভূত প্রক্রিয়া থেকে সরে আসতে হবে। জেলা পর্যায়ের সমন্বয় ও স্থানীয় চাহিদার আলোকে বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। স্বাস্থ্য বাজেটের বরাদ্দকৃত অর্থের অসমতা দূর করতে হবে। অঞ্চলভিত্তিক চাহিদা ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে বাজেট বরাদ্দ প্রদান করতে হবে। সারাদেশে দক্ষ চিকিৎসকের সুষম বন্টন এবং অধিক সংখ্যক নার্স তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। স্বাস্থ্যখাতে সকল শূন্যপদ অনতিবিলম্বে পূরণ করতে হবে। প্রত্যন্ত ও পার্বত্য অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবার দিকে সরকারের নজর দিতে হবে। চরাঞ্চলের জন্য প্রয়োজনীয় 'রিভার এম্বুলেন্স' প্রদান করতে হবে।
- চিকিৎসকদের নিয়মিত কর্মস্থলে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে; এর সাথে সাথে স্বাস্থ্যখাতের সকল প্রকার অপচয়, অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতি দূর করতে হবে। ওষুধ শিল্পের মান ও মূল্য উভয়ই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সকল পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের মান উন্নয়ন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণে প্রতিটি হাসপাতালে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি সমন্বয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা সচল ও নিয়মিত করতে হবে।
- স্বাস্থ্যখাতের বাজেট বরাদ্দ জিডিপি'র ৫ শতাংশ প্রদান করতে হবে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ অনুযায়ী, একটি দেশের মোট স্বাস্থ্য ব্যয়ের ৬৮ শতাংশ বহন করার কথা সরকারের, বাকি ৩২ শতাংশ আসবে সরাসরি জনগণের পকেট থেকে। এ আলোকে স্বাস্থ্যখাতের বাজেট বরাদ্দ প্রদান করতে হবে।
- কমিউনিটি ক্লিনিকে কর্মরত সকল স্বাস্থ্য-কর্মীর ফিজিওথেরাপি প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বাজেটে বরাদ্দ প্রদান করতে হবে; স্বাস্থ্যক্ষেত্রে লোকজ জ্ঞান ও চিকিৎসকদের মূল্যায়ন ও উৎকর্ষ সাধনে যথাযথ বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

২ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ

শিক্ষা উন্নয়নের চালিকা শক্তি। এ ভাবনাকে বিবেচনায় নিয়ে স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্য ৪-এ ঘোষিনা করা হয়েছে "Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all" এ ঘোষনার আলোকে এবং বিগত সময়ের অর্জন, ব্যর্থতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মানসম্মত ও একীভূত শিক্ষার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষায় আমাদের বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ৯৭.৯৬%। সকলের জন্য শিক্ষার সুযোগ এবং ঝরে পড়া রোধ করার জন্য সরকার ১ম শ্রেণি থেকে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীর জন্য বিনামূল্যে বই বিতরণ করছে। এর সাথে সাথে ব্যাপক সংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য বৃত্তি ও উপবৃত্তি প্রদান করছে। নতুন শিক্ষক নিয়োগের পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রেণির জন্য উপকরণ হিসাবে শিক্ষা সহায়িক প্রদান করছে। নতুন স্কুল ভবন নির্মান, প্রয়োজনী অবকাঠামো নির্মানসহ দরিদ্র্যপীড়িত অঞ্চলে মিড-ডে মিল প্রদান করছে। প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষায় আমাদের চ্যালেন্জ হলো এ অর্জনসমূহ ধরে রাখার পাশাপাশি সকল শিশুর জন্য মানসম্মত ও একীভূত শিক্ষা নিশ্চিত করা। শিক্ষার উন্নয়নে বর্তমান সরকারের বহুমুখী উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাই। ২০১৬-'১৭ অর্থবছরে শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বাজেট বৃদ্ধি পেলেও ২০১৭-'১৮ অর্থবছরে সেই ধারা অব্যাহত থাকেনি। আমাদের বিশ্বাস, কিছু জাতীয় অগ্রাধিকারকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে গত বছর বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির সূচকে সাময়িক ছন্দপতন ঘটেছিল। আমাদের প্রত্যাশা, গত অর্থবছরে এটি ঘটলেও ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে সরকার বিভিন্ন অঙ্গীকার, জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা ও আর্ন্তজাতিক মানদণ্ডকে বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান করবেন, যা জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর পূর্ণ বাস্তবায়নে দৃশ্যমান অগ্রগতি লাভ, মানব সক্ষমতা উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক বৈষম্য নিরসনসহ Sustainable Development Goal (SDGs)-র ৪র্থ লক্ষ্য অর্থাৎ 'Education 2030'-র নির্ধারিত ৭টি টার্গেট অর্জনে সহায়ক হবে।

জাতীয় বাজেটে শিক্ষায় বরাদ্দ – মোট বাজেট এবং জিডিপি'র তুলনায় ক্রমান্বয়ে কমছে

২০১৭-১৮ অর্থবছরের শিক্ষাখাতের জন্য মোট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৫২৫২০ কোটি টাকা। বাজেট বক্তৃতায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী প্রাথমিক শিক্ষাকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত বর্ধিত করা, বিনামূল্যে বই বিতরণ, উপবৃত্তি প্রদান, ১১২৫টি বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন এবং ৩৪,৮৯৫ জন শিক্ষক নিয়োগ করার কথা উল্লেখ করেছিলেন। এছাড়া National Human Resource Development Fund (NHRDF) Ges National Skills Development Authority (NSDA) গঠনের প্রস্তাব, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাখাতে সেক্টর কর্মসূচি প্রণয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ, জাতীয় ফিডিং নীতিমালা প্রণয়ন এবং বেসরকারি শিক্ষকদের কল্যাণে বরাদ্দ প্রস্তাব করেছিলেন। অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যে যে সকল অর্জন ও ভবিষ্যৎ

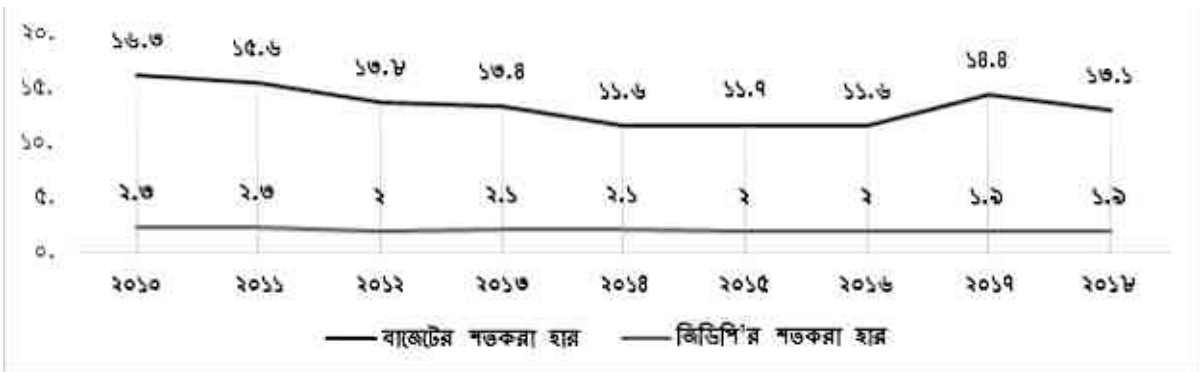

পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল তা নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন। শিক্ষা বাজেটে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর বাস্তবায়ন বিষয় প্রতিফলিত হয়নি। আপাতদৃষ্টিতে অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতার প্রস্তাবনাগুলো চমকপ্রদ মনে হলেও 'সবার জন্য গুণগত শিক্ষা' বিষয়ে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা নেই।

প্রস্তাবনা

১. বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে শিক্ষা খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ লক্ষ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে শিক্ষাখাতে মোট বাজেটের ন্যূনতম ১৮% বরাদ্দ দেওয়ার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব করছি এবং পর্যায়ক্রমে ১-২% বৃদ্ধি করে ন্যূনতম সময়ের মধ্যে ২০%-এ উন্নীত করার দাবি করছি। একই সঙ্গে বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ও কার্যকর ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে পরীক্ষামূলকভাবে জেলা ও উপজেলাভিত্তিক শিক্ষা পরিকল্পনা, অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন শুরু করার দাবি করছি।

- শিক্ষকতা পেশায় মেধাবীদের আকৃষ্ট এবং তাদের পেশাজীবিতা উন্নয়নের লক্ষ্যে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা তৈরি, চারবছর মেয়াদী কোর্স প্রচলন, শিক্ষকদের জন্য যুগোপযোগী বেতন কাঠামো প্রণয়ন, বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ এবং নিয়োগের পূর্বে তাদের প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখা।

- শিক্ষা উপবৃত্তির টাকার পরিমান মাথাপিছু ১০০ থেকে বৃদ্ধি করে কমপক্ষে ৩০০ টাকায় উন্নীত করতে হবে।

- বিজ্ঞান শিক্ষায় অধিক শিক্ষার্থী আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লাইব্রেরি সম্প্রসারণের পাশাপাশি বিজ্ঞানাগার, কম্পিউটার ল্যাব ইত্যাদি স্থাপনসহ সহজ ভাষার বিজ্ঞান পুস্তিকা সরবরাহ করে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের জন্য যথাযথ বরাদ্দ প্রদান করার জন্য সুপারিশ রাখছি।

- এটি আনন্দের বিষয় যে, উচ্চশিক্ষায় বিশেষ করে টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল শিক্ষা, চিকিৎসা শিক্ষা, প্রকৌশল শিক্ষাসহ শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু সে তুলনায় আবাসন, যাতায়াত সুবিধাসহ জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো বাড়ছে না। তাই ২০১৮-'১৯ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে এ ধরনের উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আবাসনসহ নারী শিক্ষার্থীবান্ধব প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

- Draft School Feeding Policy অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে দেশের প্রত্যন্ত ও পিছিয়ে পড়া অঞ্চল বিশেষ করে চর, হাওর, চা বাগান, পার্বত্য ও আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল এবং নগরীর বস্তি এলাকার সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা।

- সকল ধরণের প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থাসহ তাদের উপযোগী প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো এবং প্রতিবন্ধীবান্ধব শিক্ষা উপকরণের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান করা।

- সম্প্রতি ব্যানবেইসের (BANBEIS) এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, প্রাথমিক শিক্ষায় প্রতি পাঁচজনে একজন এবং মাধ্যমিক শিক্ষায় প্রতি দশজনে চারজন শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে। তাই আসন্ন জাতীয় বাজেটে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে ঝরে পড়ার হার ঠেকাতে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির বাজেট বৃদ্ধি ও বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ বাস্তবায়নের দাবি জানাচ্ছি।

বাজেটে কৃষির অগ্রাধিকার ও খাদ্য নিরাপত্তা

দেশের সর্ববৃহৎ ব্যক্তিখাত কৃষি, যা বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান কর্মকান্ড এবং জীবনীশক্তি। দুই-তৃতীয়াংশ গ্রামীণ পরিবার কৃষি ও অকৃষিজ উভয় আয়ের ওপর নির্ভরশীল। শহরে বসবাসকারীদের মধ্যেও ১১ শতাংশ মানুষ সরাসরি কৃষি কাজের সাথে যুক্ত। বাংলাদেশ শ্রমশক্তি জরিপের (২০১৩) হিসাব মতে, দেশের মোট শ্রমশক্তির ৪৫.৭ শতাংশ কৃষিতে নিয়োজিত রয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান কমে শতকরা ১৪.৭৫ ভাগে নেমে এসেছে। ক্রমাগত রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ হ্রাস পাওয়ায় জিডিপিতে কৃষির অবদান প্রায় ৪৫ শতাংশ কৃষি থেকেই আসে।[১] কৃষি জনগণের খাদ্য ও পুষ্টির নিশ্চয়তা, কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য হ্রাসকরণের মত বিষয়াদির সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাসকরণে কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়ন এবং প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা অপরিহার্য।

দেশের মোট শ্রমশক্তির প্রায় অর্ধেক কৃষিতে নিয়োজিত

জাতীয় বাজেটে কৃষি

২০১৭-১৮ অর্থবছরের ৪ লাখ ২৬৬ কোটি টাকার বাজেটে কৃষিখাতে বরাদ্দ ছিল সর্বমোট ২৪ হাজার ৪৩০ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ৬.১ শতাংশ। ২০১০-১১ থেকে ২০১৭-১৮ সাল পর্যন্ত মোট বাজেট ২৫৫.৩২ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও সার্বিক কৃষিখাতে বরাদ্দ বেড়েছে ৯৯.০৩ শতাংশ। বর্তমান সরকারের চলমান দুই মেয়াদে দেখা যায়, ২০০৯-১০ অর্থবছরের কৃষিখাতে বরাদ্দ ছিল

জাতীয় বাজেটে কৃষিখাতে বরাদ্দ

২০১০-১১ থেকে ২০১৭-১৮

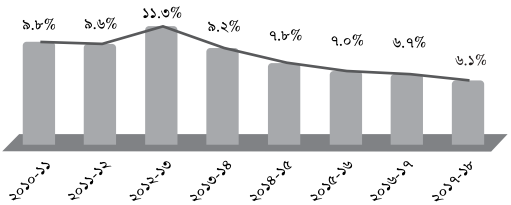

মোট বাজেটের ১০.৯ শতাংশ আর ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তা নেমে এসেছে মোট বাজেটের ৬.১ শতাংশে। এই ৬.১ শতাংশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ। শুধু কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাজেট পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কৃষি-মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ ছিল ১৩ হাজার ৬৭৬ কোটি টাকা (৪.০১%), আর ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে তা হয়েছে ১৩ হাজার কোটি টাকা (৩.৪০%)। যদি টাকার অংকে হিসাব করা হয় তাহলে গত অর্থবছরের তুলনায় চলতি অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ ৭৬ কোটি আর শতাংশে হিসাবে ০.৬১% টাকা কমেছে।

কৃষি-ভর্তুকি

বর্তমান সরকারের রাজনৈতিক অগ্রাধিকার হলেও বাজেটে কৃষি-ভর্তুকির পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। বিগত তিন বছরের প্রস্তাবিত বাজেটে কৃষি-ভর্তুকি ৯০০০ কোটি টাকায় আটকে ছিল, যা সংশোধিত বাজেটে কমে গিয়ে ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে যথাক্রমে ৭০০০ কোটি টাকা ও ৬০০০ কোটি টাকায় নামিয়ে আনা হয়। ভর্তুকির ক্ষেত্রে সার, বীজ, সেচ সুবিধা গেলে ক্ষুদ্র কৃষক

১ কৃষি সাংবাদিকতা, সম্পাদনা আবু জাফর মো. শফিউল আলম ভূইয়া, চন্দ্রাবতী একাডেমি, ঢাকা (২০১৬)

উপকৃত হবে। কৃষকদের কৃষিযন্ত্র সংগ্রহে উৎসাহিত করতে কিছু যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ৫০ শতাংশ ভর্তুকি প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে। এটি ভালো উদ্যোগ হলেও এর ব্যাপ্তি যেমন খুবই কম অন্যদিকে এই জাতীয় বড় যন্ত্র সাধারণত: ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের জন্য প্রয়োজন পড়ে না। দেশে কৃষিজ উৎপাদন বাড়লেও কৃষিখাতে জনপ্রতি ব্যয় বেড়েই চলছে। আইএফপিআরআইয়ের গ্লোবাল ফুড পলিসি রিপোর্টেও তথ্যানুযায়ী, ১৯৮০ সালে কৃষিখাতে জনপ্রতি ব্যয় ছিল ৩ দশমিক ৫৬ ডলার। ২০১৪ সালে এসে এ ব্যয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১ দশমিক ৪১ ডলারে। তাই কৃষি-ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ব্যয় কমানোর বিকল্প নেই। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ সকল মানুষের জন্য খাদ্য ও পুষ্টির নিশ্চিত করতে হলে প্রতিবছর উৎপাদন বাড়িয়ে যেতে হবে গড়ে ৪ থেকে ৫ শতাংশ হারে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ লক্ষ্যমাত্রা নামিয়ে সর্বোচ্চ ৩.৫ শতাংশে নির্ধারণ করা হলেও গত ৩ বছর ধরে এ লক্ষ্যমাত্রাও অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না।[২] কৃষিখাতে মূল বরাদ্দ ও ভর্তুকি উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ানো না গেলে ভবিষ্যতেও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কঠিন হবে। ফলে আমাদের নির্ভরশীল হতে হবে কৃষিপণ্য আমদানির ওপর, যা গত কয়েক বছর ধরে ক্রমশ বেড়েই চলছে। এ ক্ষেত্রে আমদানি বিকল্প নীতি গ্রহণ করে কৃষির অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কৃষিখাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে বাজেট প্রণয়ন করতে হবে।

কৃষিপণ্যের লাভজনক মূল্য

ভোক্তামূল্য কম রাখতে সরকার যতটা তৎপর। কৃষকের জন্য লাভজনক মূল্য নিশ্চিত করাটাও একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে যাদের মুখ্য অবদান সেই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে দরকার কৃষিপণ্যের মূল্য সমর্থন এবং ন্যায্য সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণ করা। পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে দেশে খাদ্যশস্য ধান/গম ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি মূল্য সহায়তায় মূলত: চালকল মালিকরাই লাভবান হন। তাছাড়া সরকারি ক্রয়মূল্য চলতি বাজার দরের চেয়ে কখনো কখনো কম থাকে এবং তা বাজারে পণ্যমূল্যের ওপর প্রভাব ফেলার জন্য তা যথেষ্ট নয়। বর্তমানে সরকারি সংগ্রহের পরিমাণ মোট উৎপাদনের

প্রায় ৪ শতাংশ।[৩] এটি ন্যূনপক্ষে ৮ থেকে ১০ শতাংশে উন্নীত করতে হবে এবং সরাসরি কৃষকের খামার থেকে ক্রয়ের ব্যবস্থা নিতে হবে। তাছাড়া পাট, ডাল ও তেলবীজসহ অন্যান্য ফসলের জন্যও সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণ করা জরুরি। সাম্প্রতিক 'ন্যাশনাল সার্ভে অ্যান্ড সেগমেন্টেশন অব স্মলহোল্ডার হাউজহোল্ডস ইন বাংলাদেশ' জরিপে দেখা যায়, উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য না পাওয়ার কারণে তারা দারিদ্র্য অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। 'ক্রেতাদের সুযোগ নেয়ার প্রবণতা, পরিবহন ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাব এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্যের কারণে ফসলের ন্যায্যমূল্যও পাচ্ছেন না তারা। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ক্রেতাদের সুযোগ নেয়ার প্রবণতার কথা জানিয়েছেন ৪৪ শতাংশ। যোগাযোগ অবকাঠামোর অভাব ও মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্যের দিকে আঙুল তুলেছেন যথাক্রমে ১৪ ও ১১ শতাংশ ক্ষুদ্র কৃষক।'[৪]

কৃষিঋণ

কৃষিতে বিনিয়োগ প্রয়োজনের তুলনায় সবসময়ই অপ্রতুল। কৃষি আমাদের সবচেয়ে বড় ব্যাক্তিখাত হলেও, শিল্পখাতের প্রতি যে রকম গুরুত্ব দেওয়া হয় কৃষিখাতের প্রতি রাষ্ট্র ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সেই মনোযোগ নেই। ইতোমধ্যে সরকার ১০ টাকা জমা দিয়ে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা, ন্যূনপক্ষে ২৫ শতাংশ ঋণ কৃষিখাতে প্রদানের জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা দেওয়া, মসলা ফসলের জন্য ৪ শতাংশ সুদে এবং দুগ্ধ খামার স্থাপনের জন্য ৫ শতাংশ সুদে ঋণ দেওয়ার কার্যক্রম শুরু করেছে। কিন্তু, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার সুযোগ নিতে পারে না। সরকারি হিসেবে কৃষিঋণ বিতরণের পরিমাণ বাড়লেও সত্যিকারার্থে কতজন কৃষক কৃষিঋণ পেয়েছে তা একটি বড় প্রশ্ন। এছাড়াও, এখনো

৩ আসন্ন বাজেট ও কৃষি খাত, ড. জাহাঙ্গীর আলম, দৈনিক যুগান্তর, ২৫ মে, ২০১৭
৪ দৈনিক প্রথম আলো, ১২ জুলাই ২০১৭

কৃষিঋণে সুদেও পরিমাণ বেশি, কৃষিঋণের সুদের হার ৬ শতাংশে নামিয়ে আনা জরুরি। দারিদ্র্য হ্রাসকরণে কৃষিখাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সম্প্রতি দেশে পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা যায়, কৃষি উৎপাদন ১ শতাংশ বৃদ্ধি পেলে দারিদ্র্যের হার ০.৪১ শতাংশ হ্রাস পায়।[৫] স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়েছে ৩.১ শতাংশ হারে। এ সময় দেশে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে বছরে গড়ে ১.৪ শতাংশ হারে। কৃষিখাতে উৎপাদন বাড়লে খাদ্য ও পুষ্টির সরবরাহ বৃদ্ধি পায় এবং খাদ্যপণ্যের মূল্যে স্থিতিশীলতা আসার ফলে তা দ্বিগুণ হারে গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাস করে। তাই দারিদ্র্য হ্রাসের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্যও কৃষিতে বিনিয়োগ করা জরুরি।

দারিদ্র্য হ্রাসে	কৃষি উৎপাদন ↑	দারিদ্র্য হ্রাস ↓
কৃষিখাতের অবদান	১%	০.৫%

জৈবকৃষি

২০১৬ সালে বর্তমান সরকার কৃষি ব্যবস্থাকে টেকসই করার লক্ষ্যে 'জাতীয় জৈব কৃষিনীতি' প্রণয়ন করেছে। যা টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। যদিও, জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিবীজ উন্নয়ন, বর্ধিতকরণ, মাননিরূপণ ও প্রযুক্তি বিস্তারে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল ৫ কোটি ৩৩ লাখ টাকা। অন্যদিকে, বিএডিসির জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ সীমিত, যা বীজের ওপর কৃষকের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও জলবায়ু সহিষ্ণু বীজ উদ্ভাবনে বিএডিসিকে সহায়তা করবে না।

প্রস্তাবনা

দেশের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতি সংস্কার এবং সে অনুযায়ী কৃষিতে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা জরুরি। এ বিষয়ক নীতিকৌশল ও বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলো অবশ্যই বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন।

১. বাজেটের আকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কৃষির জন্য বরাদ্দ বাড়াতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন, কৃষিতে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা, কর্মসংস্থান, খাদ্য নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় রেখে জাতীয় বাজেটের ২০ শতাংশ কৃষিতে বরাদ্দ রাখা। জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি মোকাবিলা করে জলবায়ু সহিষ্ণু স্থায়িত্বশীল কৃষিকে উৎসাহিত করতে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং গবেষণাখাতে বরাদ্দ রাখতে হবে;

২. কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণ ও সরকারি-বেসরকারি কৃষিপণ্য ক্রয়পদ্ধতিতে সংস্কার আনতে 'জাতীয় কৃষি পণ্য মূল্য কমিশন' গঠন করতে হবে। কৃষকের উৎপাদন খরচ বিবেচনা করে ধানের আগাম মূল্য ঘোষণা করতে হবে এবং নির্ধারিত ডিলারের কাছে কৃষকেরা যাতে সরাসরি ধান বা কৃষি সমবায়গুলো তাদের প্রক্রিয়াজাতকৃত চাল বিক্রি করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রকৃত কৃষকদের নিয়ে 'উৎপাদন ও বিপণন সমবায়' গঠন করে সমবায়ের মাধ্যমে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ও হিমাগার স্থাপন করতে হবে। 'শস্য গুদাম ঋণ প্রকল্প'কে পুনরুজ্জীবিত করে 'শস্য সংরক্ষণ ঋণ' চালু করতে হবে।

৩. ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষকদের জন্য সুদবিহীন বা স্বল্পসুদে মৌসুমভিত্তিক কৃষিঋণ সহজলভ্য করতে হবে। বর্গাচাষী, ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষকদের জন্য সরকারি সুবিধা ও উপকরণ সহায়তা প্রদানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৪. নারী কৃষকদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে ঋণসহ সকল সরকারি পরিসেবা ও প্রণোদনায় অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। নারীবান্ধব কৃষি গবেষণায় বিনিয়োগ করতে হবে।

৫. কৃষি জমির অকৃষিখাতে ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। 'ভূমি ব্যাংক' ব্যবস্থা চালু করে অনুপস্থিত ভূমিমালিকদের কাছ থেকে জমি 'ভূমি ব্যাংকে' জমা নিয়ে তা প্রকৃত কৃষকদের চাষাবাদের জন্য সহজলভ্য করা যেতে পারে। কৃষিজমি সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করতে হবে;

৬. ক্ষতিকর বিদেশি বীজ আমদানি বন্ধ, বিটি বেগুন, গোল্ডেন রাইসসহ বিতর্কিত জিএমও কৃষি প্রবর্তন বন্ধ করতে হবে। ফসলভিত্তিক আঞ্চলিক বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণাগার তৈরি করতে হবে। বীজ সার্বভৌমত্ব অর্জনে বিএডিসিকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করতে হবে।

---

৫ Strategic Agricultural Sector and Food Security Diagnostic for Bangladesh, BRAC and the UK's Department for International Development./

৬ আসন্ন বাজেট ও কৃষি খাত, ড. জাহাঙ্গীর আলম, দৈনিক যুগান্তর, ২৫ মে, ২০১৭

শ্রম ও কর্মসংস্থান বাজেট

প্রেক্ষাপট

তারুণ্য ও কর্মক্ষম জনশক্তির দিক দিয়ে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের চেয়ে এগিয়ে। জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের এক প্রতিবেদনে (২০১৬) বলা হয়েছে, বাংলাদেশ এখন তরুণ জনগোষ্ঠীর রাষ্ট্র। এ অঞ্চলের ৪৫টি দেশের জনসংখ্যাভিত্তিক তথ্য বিশেষণ করে সংস্থাটি বলছে, বাংলাদেশ তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশ লেবারফোর্স সার্ভে ২০১৬–১৭ এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট শ্রম শক্তির ২৯.৫ শতাংশ (১৮ মিলিয়ন) যুবা যাদের মধ্যে ৫.৯৩ মিলিয়ন তরুণী এবং ১২.০১ মিলিয়ন তরুণ। এদের বড় অংশ কর্মহীন; অথচ অনেক বিদেশি বাংলাদেশে কাজ করছে। এর প্রধান কারণ হল চাহিদা ও যোগানে ঘাটতি। অন্যদিকে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার পথে যাত্রা করেছে। যা ২০২৪ সালে পূর্ণতা পাবে। সেই পর্যন্ত যেতে হলে আমাদের যে স্থিতিশীলতার মধ্যে যেতে হবে, তার জন্য দরকার বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং রপ্তানি বহুমুখীকরণ। কিন্তু বাজেটে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলো এখনো অবহেলিত।

শ্রমশক্তি ও কর্মসংস্থান: বর্তমান অবস্থা

দেশে বেকারের সংখ্যা এখন প্রায় ২৬ লাখ। উচ্চ শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্বের হার সবচেয়ে বেশি, ৯ শতাংশ। এর মানে হলো স্নাতক কিংবা আরও উচ্চতর ডিগ্রীধারী প্রতি ১০০ জনে ৯ জন বেকার। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে ব্যর্থ হচ্ছে। দেশে প্রতিবছর প্রায় ২০ লক্ষ নতুন মানুষ কর্মশক্তিতে যোগ হয় তার মধ্যে আমরা সরকারি খাত, বেসরকারি খাত মিলে ১০–১১ লক্ষ লোকের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ করতে পারি। বাকি ৯ লক্ষ লোক অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কোন না কোনভাবে জীবিকা নির্বাহ করছে। বাংলাদেশ লেবার ফোর্স সার্ভে ২০১৬–১৭ অনুযায়ী, বাংলাদেশের বৃহৎ শ্রমশক্তির মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক সংখ্যা ৯০ লক্ষ ৯৪ হাজার এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে ৫ কোটি ১৭ লক্ষ ৩৪ হাজার। অর্থাৎ, মোট শ্রম শক্তির শতকরা ৮৫.১ ভাগ শ্রমিকই নিয়োজিত রয়েছে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে। শ্রম শক্তিতে নারী পুরুষের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে দেখা যায় ১৭.৯ শতাংশ পুরুষ ও ৮.২ শতাংশ নারী প্রাতিষ্ঠানিক খাতে এবং ৮২.১ শতাংশ পুরুষ ও ৯১.৮ শতাংশ নারী অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত আছেন। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের এ বিশাল শ্রমশক্তি সরকারি সকল সুযোগ–সহায়তার বাইরে। এদিকে, নতুন শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী, দেশে বেকারের সংখ্যা এখন প্রায় ২৬ লাখ।

বর্তমান সরকারের বাজেট বরাদ্দের ধারা

জাতীয় আয়ে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ বিপুল হলেও উন্নয়ন বরাদ্দে তাদের হিস্যা অপ্রতুলই থাকছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২০১৬–১৭ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৭–১৮ অর্থবছরে বরাদ্দ কমেছে ৪৬ কোটি টাকা। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন ব্যয় ১৬৮ কোটি টাকা এবং অনুন্নয়ন ব্যয় ৯৪ কোটি টাকা যা গতবছর ছিল যথাক্রমে ২০৩ কোটি এবং ১০৫ কোটি টাকা।

সারনি ১: প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রম শক্তি (%)

খাত	বাংলাদেশ			শহর			গ্রাম		
	মোট	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী
প্রাতিষ্ঠানিক	১৪.৯	১৭.৯	৮.২	২২.৭	২৬.৪	১২.৭	১১.৯	১৪.৪	৬.৭
অপ্রাতিষ্ঠানিক	৮৫.১	৮২.১	৯১.১	৭৭.৩	৭৩.৬	৮৭.৩	৮৮.১	৮৫.৬	৯৩.৩

উৎসঃ বাংলাদেশ লেবার ফোর্স সার্ভে ২০১৬–১৭

শ্রম ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও বিনিয়োগ

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সরকার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে মানব সম্পদ দক্ষতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। পাশাপাশি কর্মক্ষম জনশক্তিকে সঠিকভাবে

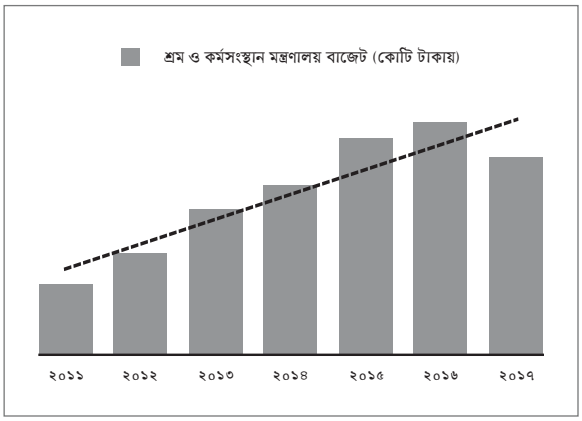

কাজে লাগানোর জন্য দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি চলমান রয়েছে। ১০০ অর্থনৈতিক অঞ্চল হয়েছে। এসব অঞ্চলে বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে বলে সরকার আশা করছে। তথ্যপ্রযুক্তি খাতেও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে শ্রম ও কর্মসংস্থান, প্রবাসীকল্যাণ ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে বাজেট বরাদ্দ খুবই কম। অর্থবিভাগ থেকে ২০১৬ সালে প্রকাশিত আগামী ৩ বছরের জন্য মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি-বিবৃতি শীর্ষক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কর্মসংস্থানের জন্য কর্ম-পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। যার মধ্যে আত্ম-কর্মসংস্থান ও ব্যক্তি উদ্যোগের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশকে উৎসাহিত করে বেকারত্ব দূর করা, ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা ইত্যাদি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাজেটে এর প্রতিফলন নেই বললেই চলে।

ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট তত্ত্ব অনুযায়ী বাংলাদেশে কর্মক্ষম বিশাল জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদে পরিণত করার জন্য প্রয়োজন নীতিগত দিক নির্দেশনা ও পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ। এসব বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে শ্রম বান্ধব বাজেট প্রণয়ন করা শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়ন, অর্থনৈতিক মুক্তি ও রাষ্ট্রীয় খ্যাতি অর্জনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সুযোগের সদ্ব্যবহারের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কৌশলগত বিনিয়োগের প্রয়োজন রয়েছে।

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি পুনঃনির্ধারণ, কর্ম-পরিবেশ ও শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। টেকশই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ৮ নং লক্ষ্য হিসেবে 'শোভন কাজ' অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বিভিন্ন খাতে শোভন কাজের এ এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে গেলে প্রচুর বিনিয়োগ প্রয়োজন।

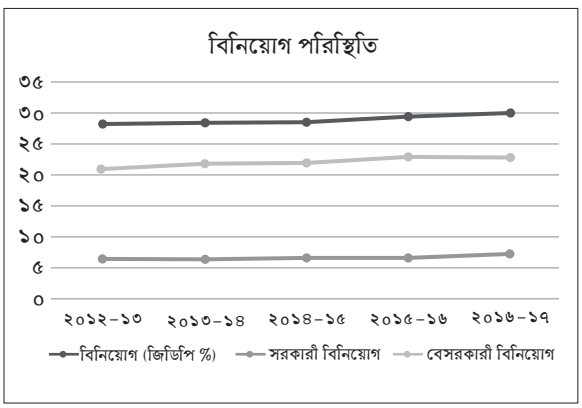

চিত্র ১: জিডিপি-র শতাংশ হিসাবে গ্রস দেশীয়, সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ

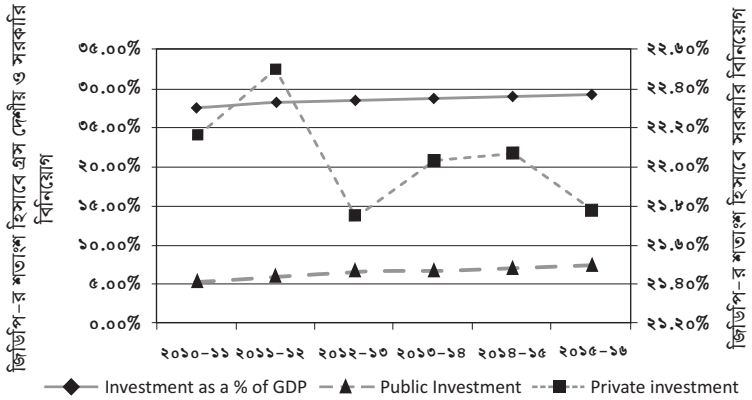

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

সুপারিশমালা

- দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে (লস অব ইয়ার আরনিং) মৃত্যুর সময় থেকে চাকরির মেয়াদকাল পর্যন্ত ইনক্রিমেন্ট, মূল্যস্ফীতির ভিত্তিতে মজুরি নির্ধারণ করে ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থাপনার জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে। শ্রমিকের যথাযথ ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে স্থায়ী মানদণ্ড প্রণয়ন ও তা কার্যকর করতে হবে। দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিকের পুনর্বাসনের জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে;

- শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা এবং হাসপাতাল স্থাপন করা। মালিক কর্তৃক শ্রমিকের স্বাস্থ্য-বীমা নিশ্চিত করতে হবে;

- অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহণ বেশি। প্রচুর নারী শ্রমিক গণপরিবহনে প্রতিদিন যাতায়াত করে। নারীর নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে সচেতনতা বাড়াতে হবে। গণপরিবহনে যাতে নারীরা নিরাপদ ভাবে যাতায়াত করতে পারে, সেজন্য থোক বরাদ্দ রাখতে হবে;

- সকল শ্রমিকের জন্য ন্যূনতম মজুরীর ব্যবস্থা করতে হবে। পে-স্কেল, জিডিপি, মাথাপিছু আয় সব কিছু মাথায় রেখে এটা নির্ধারণ করতে হবে;

- শ্রমিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সেক্টর ও কারখানা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে (ক) প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, (খ) জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনা, এবং (গ) গবেষণা কার্য পরিচালনায় বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখতে হবে;

- জাতীয় মজুরি কমিশন/নিম্নতম মজুরী বোর্ডকে শক্তিশালীকরণ ও পুনর্গঠনে জাতীয় বাজেটে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ রাখা;

- জাতীয় পেনশন স্কিম প্রণয়নের মধ্য দিয়ে এনজিও ও ব্যক্তিমালিকানাধীন সকল চাকুরিজীবীর জন্য পেনশন ব্যবস্থা চালু করা;

- লেদার সেক্টরের জন্য একটা ন্যূনতম মজুরি আছে কিন্তু তা কার্যকর নয়, এটি কার্যকর করতে হবে;

- শুধু শ্রমিকদের জন্য নয়, কর্মজীবী মানুষের জন্য বাড়ি ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইনের পাশাপাশি বিধিমালা প্রণয়ন ও তার প্রয়োগ;

- ট্যানারি শ্রমিকদের জন্য পরিবেশবান্ধব কর্মপরিবেশ থাকতে হবে;

- শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিতে বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে;

- শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে গবেষণা প্রকল্প নেওয়া ও তা চলমান রাখতে শ্রম বিষয়ক স্বাস্থ্যসেবা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা;

- নারী কৃষি শ্রমিকের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। মৌসুমী শ্রমিকের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণে বিধিবিধান প্রণয়ন ও তাদের কর্মদক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

- বীজ উৎপাদন, বিপণন, সংরক্ষণ এবং কৃষি উপকরণ সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি শ্রমিকদের মাঝে বিতরণের ব্যবস্থা করা;

- রাষ্ট্রীয় পাটকলগুলোকে আবার চালু করে সেগুলোর আধুনিকায়ন নিশ্চিত করতে হবে;

- শ্রমিকদের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা চালুর লক্ষ্যে বাজেটে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ রাখা;

- বেসরকারি খাতের শ্রমিকের আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ করা।

স্থানীয় সরকারে অর্থায়ন ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ

ভূমিকা

বিভিন্ন সময়ে নানা সংস্কার কার্যক্রম গৃহীত ও বাস্তবায়িত হলেও এ দেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো দীর্ঘদিন থেকেই আর্থিক সক্ষমতা ও সুশাসনের ক্ষেত্রে সংকটের মধ্যে রয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোতে স্থানীয় পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন সম্পর্কিত কিছু কার্যক্রম থাকলেও জাতীয় বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় এর কোনো ভূমিকা দেখা যায় না। বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণ একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানেও (সংবিধানের চতুর্থ ভাগের ৩য় পরিচ্ছেদ– 'স্থানীয় শাসন' অংশের ৫৯ নং অনুচ্ছেদ এবং 'স্থানীয় শাসন–সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা' শিরোনামে অনুচ্ছেদ ৬০) এ বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক–নির্দেশণা রয়েছে।

জাতীয় বাজেট ও স্থানীয় সরকার

আমাদের দেশের জাতীয় বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে একাধারে কেন্দ্রীভূত ও আমলাতান্ত্রিক একটি প্রক্রিয়া হিসেবে অবহিত করা যায়। বাজেটের মাধ্যমে জাতীয়ভাবে যে ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনার কথা বলা হয় তা সাধারণ মানুষের দ্বোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য কী আকারের বরাদ্দ প্রদান করা হয় সে নিয়ে আলাপ–আলোচনা হয় খুব সামান্য।

জাতীয় বাজেটে স্থানীয় সরকারের জন্য বরাদ্দ

জাতীয় বাজেটে স্থানীয় সরকারের জন্য যে বরাদ্দ থাকে তা স্থানীয় সরকার বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ব্যয় হয়ে থাকে। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ বাজেটের একটি মাত্র অংশ ৫টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়। মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও অধিদপ্তরে বিভাজনের পরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য প্রকৃত বরাদ্দ থাকে অত্যন্ত কম। এ স্বল্প বরাদ্দের উপরও খবরদারি চলে। সার্বিকভাবে বঞ্চনার শিকার হয় স্থানীয় সাধারণ মানুষ। ২০১৭–১৮ অর্থ–বছরে ২,৮৭,৯৯১ কোটি টাকার যে বাজেট ঘোষণা করা হয়েছিল সেখানে মোট বাজেটের ৬.৯ শতাংশ বরাদ্দ ছিল স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন খাতে। বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য এ বরাদ্দ শতকরা ২ ভাগের বেশি নয়।

চলমান অর্থ–বছরের বাজেটে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রত্যেক পর্যায়ে (ইউনিয়ন পরিষদ ছাড়া) বরাদ্দ আগেরবারের চেয়ে বৃদ্ধি পেলেও এর সিংহভাগই ব্যয় হয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোর স্থানীয় আমলাদের মাধ্যমে, যা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যয়ের তুলনায় প্রায় ৭০০ শতাংশ বেশি (এম এম আকাশ, ২০১১)। এ ছাড়া জাতীয় রাজস্ব বণ্টন নীতি সুনির্দিষ্ট ও যথাযথ না হওয়ায় স্থানীয় সরকারগুলো বঞ্চিত হয়। স্থানীয় সম্পদের উপর, বিশেষত হাট, ঘাট, জলমহাল ইত্যাদির

ক্রমিক	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	২০১৬–১৭ অর্থ বছর	মোট উন্নয়ন বাজেটের %	২০১৭–১৮ অর্থ বছর	মোট উন্নয়ন বাজেটের %
০১	ইউনিয়ন পরিষদ	১০ কোটি টাকা		১০ কোটি টাকা	
০২	উপজেলা পরিষদ	৪৫০ কোটি টাকা		৫০০ কোটি টাকা	
০৩	জেলা পরিষদ	৩৯০ কোটি টাকা		৫০০ কোটি টাকা	
০৪	পৌরসভা	৪০০ কোটি টাকা		৪৪০ কোটি টাকা	
০৫	সিটি কর্পোরেশন	২৫০ কোটি টাকা		৩৫০ কোটি টাকা	
		১৫০০ কোটি টাকা	**২%**	**১৮০০ কোটি টাকা**	**২%**

মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের পরিধিও নানা পরিপত্রের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। বর্তমানে ভূমি হস্তান্তর করের খুব সামান্য অংশ, মাত্র ১ শতাংশ ইউনিয়ন পরিষদ এবং ২ শতাংশ পৌরসভা পেয়ে থাকে। অন্যদিকে, নির্বাচিত পরিষদ বা স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের দিক থেকেও নিজস্ব আয় বৃদ্ধি, বিশেষত যথাযথ উপায়ে হোল্ডিং ট্যাক্স সংগ্রহের ক্ষেত্রে দুর্বলতা লক্ষ করা যায়। গ্রামীণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো স্থানীয় সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে ৪৫-৬৩ শতাংশের মধ্যেই ঘোরপাক খাচ্ছে (আমিরুল ইসলাম চৌধুরী, ২০১৫)। ইউনিয়ন পরিষদ সংক্রান্ত আইনে ওয়ার্ড সভার মাধ্যমে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের যে বিধান রয়েছে, তারও আশানুরূপ বাস্তবায়ন চোখে পড়ে না।

চাই ক্ষমতার গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ

বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার

২০১৩ সালে তৎকালীন ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এক মতবিনিময় সভায় বলেছিলেন, "কেন্দ্রের হাতে শুধু পলিসি তৈরি, মনিটরিং ও অর্থ বরাদ্দের দায়িত্ব থাকবে। বাকি সমস্ত ক্ষমতাগুলো একেকটি স্তরে আমরা ছেড়ে দেব (দৈনিক করতোয়া, ২৭ আগস্ট ২০১৩)।" দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ক্ষমতাসীন দলের ইশতেহারে "আমাদের এবারের অগ্রাধিকার: সুশাসন, গণতন্ত্রায়ন ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রায়ন" শিরোনামে ১.৭ (ক্ষমতার বিকেন্দ্রায়ন, স্থানীয় সরকার ও প্রশাসন) অংশে উল্লেখ করা হয়েছিল, "রাষ্ট্র পরিচালনায় এবং জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের ক্ষমতায়ন ও অধিকতর অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে। বর্তমান কেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক কাঠামোর গণতান্ত্রিক পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদের কাছে অধিকতর ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ করা হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় আইন-শৃংখলা, অবকাঠামো উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি স্তর বিন্যাসের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হবে। সর্বস্তরে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে অধিকতর ক্ষমতাশালী ও দায়িত্বশীল করার লক্ষ্যে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।" ২০১৪ সালে সচিবদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতায় তিনি ইশতেহারে উল্লিখিত বিষয়াবলীর পুনরুল্লেখ করে বলেন, "এসব প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব সম্পদ আহরণের মাধ্যমে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। বিভিন্ন স্তরের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির কাছে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে সহায়ক ভূমিকা রাখতে হবে।" অর্থাৎ নীতিগতভাবে সংবিধানের অভিপ্রায় অনুযায়ী রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে বিকেন্দ্রীকরণের ব্যাপারে বারংবার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হলেও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নীতি ও বাস্তবতার ফারাকটা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

স্থানীয় সরকারের অভিন্ন আইনি কাঠামো

বর্তমানে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি স্বতন্ত্র একক (unit) একেকটি পৃথক ধরনের আইন দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এরফলে, এগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সঙ্গতি ও সমন্বয় নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। একটি অভিন্ন এবং একক আইনি কাঠামোর মাধ্যমে বর্তমানে বিভিন্ন ধারায় বিদ্যমান সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের এককগুলোর গঠন, কার্যক্রম ও অন্যান্য মৌলিক বিষয়াবলী, যেমন, নির্বাচন, মেয়াদ, শৃংখলা, কর্মী ব্যবস্থাপনা, অর্থায়ন, এখতিয়ার ইত্যাদি একটি সাধারণ নীতির অধীনে কাঠামোবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ নীতি

রাষ্ট্রীয়ভাবে সুনির্দিষ্ট কোনো বিকেন্দ্রীকরণ নীতি না থাকায় বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে গৃহীত পদক্ষেপগুলোর ধারাবাহিকতা বজায় থাকেনি। বিকেন্দ্রীকরণ শুধুমাত্র একটি প্রশাসনিক বা আর্থিক বিষয় নয়, এটি রাজনৈতিক বিষয়ও। **সেক্ষেত্রে স্বশাসিত স্থানীয় সরকারের এককগুলোতে যৌথতার ভিত্তিতে কর্তৃত্ব হস্তান্তর, অর্থাৎ আইনি ভিত্তিতে সেবা ও কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সকল ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, কাজ, দায়-দায়িত্ব ও সম্পদ কেন্দ্রীয় সরকার হতে সরাসরি নির্বাচিত স্থানীয় সরকার বরাবর হস্তান্তর প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই কার্যকর বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব**। এজন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণসহ পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে একটি সমন্বিত **গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ নীতি** প্রণয়ন ও তা কার্যকর করা।

প্রস্তাবনা

স্থানীয় সরকারগুলোকে স্বনির্ভর হিসেবে গড়ে তুলতে হলে, একটি সমন্বিত নীতির আলোকে ধারাবাহিক উদ্যোগের মাধ্যমে, উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে তৃণমূল থেকে ক্রমশ উপরের দিকে তুলে এনে জাতীয় পরিকল্পনা ও বাজেটের সাথে যুক্ত করতে হবে। এ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা বহাল রেখে, স্থানীয় সরকারগুলোকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও দায়িত্ব প্রদান করে, জাতীয় বাজেটে তাদের জন্য বিদ্যমান অপ্রতুল বরাদ্দ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সেইসাথে প্রয়োজন, জাতীয় বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়া ও বাজেট বরাদ্দের খাতগুলোকেও পুনর্বিন্যাস করা। এ উদ্দেশ্যে আমাদের প্রস্তাবনা হচ্ছে–

- ভূমি হস্তান্তর করের ৫% সহ স্থানীয় উৎস হতে আহরিত অন্যান্য সম্পদের (হাট–বাজার, পুকুর, খেয়াঘাট, জলমহাল, বালুমহাল ইত্যাদি) সুনির্দিষ্ট অংশ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বরাদ্দ প্রদান করা;
- শুধুমাত্র টাকার অংকে নয়, সুনির্দিষ্টভাবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য জাতীয় বাজেটের অন্তত ৫ শতাংশ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা এবং ক্রমান্বয়ে এ বরাদ্দ বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখা;
- তৃণমূল থেকে কেন্দ্রে (Bottom-up) সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করে জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন; জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়নকালে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের এসব পরিকল্পনাকে সমন্বয় করার উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের পাঁচ ও এক বছর মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন নিশ্চিত করা;
- আইন অনুযায়ী উপজেলা পরিষদে হস্তান্তরিত (১২টি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৩টি দপ্তর) এবং ইউনিয়ন পরিষদে হস্তান্তরযোগ্য (৭টি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৯টি দপ্তর) বিষয়সমূহ কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় আইনি সংশোধন এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহের বাজেট সরাসরি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তর করা;
- ইউনিয়ন পর্যায়ে হোল্ডিং ট্যাক্স আহরণ কার্যকর করার উদ্দেশ্যে আইন অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদের হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর নিয়োগের বিধান কার্যকর করা এবং সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় লোকবল বৃদ্ধি করা;
- নীতি–নির্ধারকদের (জেলা ও উপজেলা পরিষদে 'উপদেষ্টা' হিসেবে) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ন্ত্রণের মনোভাব পরিহার করে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদানকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করা;
- বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং সেবা কার্যক্রম সংক্রান্ত বিভাগগুলোর দায়–দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করার উদ্দেশ্যে আন্তঃসরকার আর্থিক কাঠামো সংস্কার করা।

জেন্ডার বাজেট

একটি দেশের নারীর ক্ষমতায়ন পূর্ণাঙ্গরূপে নিশ্চিত করার মূল দর্শন নিয়ে সরকারের আয় ও ব্যয়ের নীতির প্রভাব জেন্ডারের উপর কতটুকু পড়ে তার বিস্তারিত বিশ্লেষন থাকে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেটে[১]। এই বাজেট প্রক্রিয়ার একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো তা প্রচলিত বাজেট প্রক্রিয়ায় উপেক্ষিত কিছু আর্থ-সামাজিক বিষয়কে আমলে নেয়। যেমন- নারীর অসামঞ্জস্যপূর্ণ কাজের বন্টন এবং তাদের অমূল্যায়িত কাজ কীভাবে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অবদান রাখে, কর আদায় ও কর রাজস্বের ব্যয় কীভাবে দরিদ্র নারী ও তার উপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যদের উপর প্রভাব ফেলে এবং একই পরিবারের মধ্যে সম্পদের বন্টন কীভাবে হয়।

২০১৭-১৮ এর বাজেট বক্তৃতায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন দেশের পিছিয়ে পড়া নারীদের উন্নয়নের জন্য জন্য সরকার বেশ কিছু স্থাপনা (যেমন- হোস্টেল, ট্রেনিং সেন্টার), বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ, ভিজিডি সুবিধা প্রদান করেছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকে সরকার জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে ৪৩টি মন্ত্রণালয়কে অন্তর্ভুক্ত করে এবং ৩টি গুচ্ছে ভাগ করে প্রতিবেদন তৈরি করে-

১. নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি কৌশলের অধিনে রয়েছে ৯টি মন্ত্রণালয়;
২. উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শ্রমবাজার ও আয়বর্ধক কাজে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত কৌশলের অধীনে আছে ৯টি মন্ত্রণালয়; এবং
৩. সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধি করার কৌশলের অধীনে রয়েছে ২৫টি মন্ত্রণালয়।[২]

জাতীয় বাজেটে নারীর হিস্যা

জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত ৪০টি মন্ত্রনালয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বর্তমান অর্থবছর থেকে ৪৩টি মন্ত্রনালয়কে এ প্রতিবেদনের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ বছরের জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে লক্ষ্য করা যায় যে, গত বছরের প্রস্তাবিত ও সংশোধিত বাজেটের তুলনায় এ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট উভয়ক্ষেত্রে নারীর হিস্যা টাকার অংকে ও তার শতকরা হারেও বেড়েছে।

সারণী ১: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ে নারীর জন্য বরাদ্দ বাজেট (কোটি টাকায়)

বিবরণ	২০১৭-১৮ (প্রস্তাবিত বাজেট)	২০১৬-১৭ (সংশোধিত বাজেট)	২০১৬-১৭ (প্রস্তাবিত বাজেট)	২০১৫-১৬ (সংশোধিত বাজেট)	২০১৫-১৬ (প্রস্তাবিত বাজেট)
মোট বাজেট	৪০০২৬৬	৩১৭১৭৪	৩৪০৬০৫	২৬৪৫৬৫	২৯৫১০০
মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দে নারীর হিস্যা	২০৭৫	১৭১৯	১৬৫৬	১৩৬৮	১৩৭৯
উন্নয়ন বাজেটে নারীর হিস্যা	২৪২	১৪৪	১১৬	৯৭	১৩২
অনুন্নয়ন বাজেটে নারীর হিস্যা	১৮৩২	১৫৭৬	১৫৪০	১২৭১	১৫২৯

সূত্র: জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন ২০১৭-১৮

১ Budlender, D. and all (2002). Gender Budget Make Cents: Understanding gender responsive budgets. Retrieved from: http://www.internationalbudget.org/

২ Gender Budgeting Report 2017-18. Retrieved from: http://mof.gov.bd/en/

সারণী ২-এ দেখা যাচ্ছে, বিগত পাঁচ বছরে মোট বাজেটের তুলনায় এবং জিডিপি'র হিসাবে নারী উন্নয়নে বরাদ্দের শতকরা হার প্রায় একই রয়েছে, যথাক্রমে ২৭% ও ৫% এর বেশি; যা চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত।

সারণী ২: গত ৫ অর্থবছরে মোট বাজেটের তুলনায় নারী উন্নয়নে বরাদ্দের শতকরা হার (%)

অর্থবছর	মোট বাজেটের তুলনায় নারী উন্নয়নে বরাদ্দের শতকরা হার (%)	জিডিপির শতকরা হার (%)
২০১৩-১৪	২৭.৬৪	৫.০৬
২০১৪-১৫	২৭.৭৪	৪.২৩
২০১৫-১৬	২৭.১৭	৪.১৬
২০১৬-১৭	২৭.২৫	৪.৭৩
২০১৭-১৮	২৭.৯৯	৫.০৪

সূত্র: জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন ২০১৭-১৮

প্রস্তাবনা

৯০'র দশকে প্রথম প্রণীত জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট পুরুষের তুলনায় নারীর অংশগ্রহণকেই লক্ষ্য হিসেবে নিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু সময়ের সাথে পরিমার্জিত জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট নারীর সার্বিক ক্ষমতায়নকে লক্ষ্য হিসেবে মনে করে বলে আমরা বিশ্বাস রাখি। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমাদের সুনির্দষ্ট প্রস্তাবনাসমূহ উপস্থাপন করছি।

১. সংখ্যাতাত্ত্বিকের পাশাপাশি গুণগত বিশ্লেষন: জাতীয় বাজেটে জেন্ডার বাজেটিং করনের জন্য যে ৩টি বিশ্লেষণ পদ্ধতি রয়েছে তার সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পাশাপাশি গুণগত বিশ্লেষণ করার জন্য পরিমাপক নির্ধারণ করা উচিৎ। বিশেষত জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে, সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বরাদ্দ দেখানোর পাশাপাশি সেই বরাদ্দকৃত বাজেট আসলে নারীর কোন স্ট্র্যাটেজিক জেন্ডার চাহিদা পূরণ করছে এবং তার অগ্রগতি কতটুকু হয়েছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ থাকতে হবে।

২. বিভিন্ন মেয়াদি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি ও অগ্রগতির বিষয়ে পরিষ্কারভাবে উল্লেখকরণ: যেহেতু জেন্ডার বাজেটিং-এর দর্শন নারীর ক্ষমতায়ন পূর্ণাঙ্গ রূপে নিশ্চিত করা, তাই এর জন্য প্রয়োজন সাপেক্ষে স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি, পরিকল্পনা ও তার অগ্রগতির বিষয় বাজেটে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৩. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জেন্ডার বাজেট মনিটরিং ও অডিটিং করা: জেন্ডার বাজেটিং এ প্রতি কর্মসূচির জন্য মনিটরিং এবং বড় প্রজেক্টের জন্য অডিটিং এর ব্যবস্থা এবং তার অগ্রগতির বিষয় বাজেটিং প্রক্রিয়ায় উল্লেখ থাকতে হবে।

৪. নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণে জেন্ডার বাজেটিং করণ: নারীর পূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হবে স্থানীয় সরকার পর্যায় থেকেই। জেন্ডার বাজেটিং প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ শুধু কাগজে-কলমে ও সংখ্যায় নয়, বরং সক্রিয়ভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

৫. নারীর প্রতি নীতিমালার আলোকে অগ্রগতি দেখানো: জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নে যে কয়টি নীতিমালা সরকারের কাছে আছে তার প্রতিটির সাপেক্ষে কী কী অগ্রগতি প্রতি বছর হচ্ছে তা বাজেটে দেখাতে হবে। এ সংক্রান্ত ফলোআপ প্রতিবেদন প্রকাশের বাধ্যবাধকতা থাকতে হবে।

৬. সরকারি পরিসংখ্যানে নারীর অমূল্যায়িত শ্রমকে অন্তর্ভুক্তি করার লক্ষ্যে বিআইডিএস, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ইত্যাদি সংগঠনে সক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে এবং এ জন্য বাজেটের বরাদ্দ বাড়াতে হবে।

বাংলাদেশে দলিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও জাতীয় বাজেট*

সাধারণ অর্থে দলিত বলতে আমরা সাধারণত বুঝি সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে যারা মূলধারার জনগোষ্ঠীর কাছে 'অস্পৃশ্য' বলে বিবেচিত; এবং এর মূলে রয়েছে তাঁদের প্রতি বিদ্যমান জাত-পাত ভিত্তিক বৈষম্য। জাত-পাতভেদে বৈষম্যের চর্চা এদেশে বহুযুগের পুরনো যা আজও এদেশের ৬৫ লক্ষ জনগোষ্ঠীকে অস্পৃশ্য ও চরম দরিদ্র করে রেখেছে। নাগরিক উদ্যোগ ও বিডিইআরএম-এর যৌথ গবেষণাপত্র *'বাংলাদেশের দলিত জনগোষ্ঠী: বৈষম্য, বঞ্চনা ও অস্পৃশ্যতা'* দেখা যায় দলিত জনগোষ্ঠীর ৯০% শতাংশের নিজস্ব কোনো ভূমি নেই। এছাড়া ৬৭% দলিত জনগোষ্ঠী স্থানীয় সেলুন, চায়ের দোকান ও রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করতে পারে না। ৪৭% দলিত মন্দির, ধর্মীয় উপাসনালয় ও সামাজিক কোনো আচার অনুষ্ঠানে প্রবেশাধিকার পায় না। ৬৯% শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষার্থীদের কাছে চরম বৈষম্যের শিকার। প্রায় ৯০% দলিত শিশুরা স্কুলে ভর্তি হলেও দারিদ্র্য ও অস্পৃশ্যতার কারণে প্রাথমিক স্তর থেকেই ঝরে পড়ে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস ও পেশাগত কারণে প্রায় ৩৬% দলিত সাধারণ জ্বরসহ বিভিন্ন রোগব্যাধিতে ভুগে থাকে। কিন্তু সরকারি বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা ও কমিউনিটি ক্লিনিক থাকা সত্ত্বেও ২২% মানুষ দলিত পরিচয়ের কারণে স্বাস্থ্যসেবায় অস্পৃশ্যতার শিকার হয়ে থাকে। ফলে হাসপাতালে যাওয়ার ক্ষেত্রে তারা অনীহা প্রকাশ করে। ৩৮% দলিত অসুস্থ হলে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে যায়।

বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিককে সমান মর্যাদা ও অধিকার দেয়ার কথা বলা হলেও প্রকৃত অর্থে দলিত জনগোষ্ঠী প্রতিনিয়তই সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে (২০০৮) তাদের ইশতেহারে দলিত ও সামাজিকভাবে বঞ্চিত জনগোষ্ঠী তথাতফসীলি সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছিল; যা নিম্নরূপ- '...সংখ্যালঘু, আদিবাসী, ক্ষুদ্র নৃ-জাতিগোষ্ঠী এবং দলিতদেরপ্রতি বৈষম্যমূলক সকল প্রকার আইন ও অন্যান্য ব্যবস্থার অবসান করা হবে। ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু এবং আদিবাসীদের জন্য চাকুরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।' -নির্বাচনী ইশতেহার, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০০৮ (অনুচ্ছেদ ১৮.১)

বাজেট বরাদ্দে উপেক্ষিত দলিত জনগোষ্ঠী

বাংলাদেশের আদমশুমারিতে দলিত সম্প্রদায়কে আলাদাভাবে দেখানো হয়নি। বাংলাদেশে দলিতদের সঠিক সংখ্যা এবং তাদের সকল সম্প্রদায়ের সঠিক কোনো পরিসংখ্যান সরকারি কোনো তথ্য ভাণ্ডারে পাওয়া যায় না। দেশে দলিত জনগোষ্ঠীর সঠিক পরিসংখ্যান না থাকায় জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট বরাদ্দে এ জনগোষ্ঠী উপেক্ষিত ও বৈষম্যের শিকার। সরকারি নীতিমালা এবং বাজেটে 'দলিত' শব্দটির উল্লেখ নেই। জাতীয় বাজেটে সমাজসেবা অধিদপ্তর-এর আওতায় 'বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির' বরাদ্দ বিবরণ সারণি-১ দ্রষ্টব্য।

এছাড়াও

- ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে ১৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।
- ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন কর্তৃক পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য বহুতল ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ১৭৭ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে দলিত জনগোষ্ঠীর জন্য দেয়া এই বরাদ্দ যদি দেশের ৬৫ লক্ষ দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে বণ্টন করা হয়, তাহলে তাদের বাৎসরিক মাথাপিছু বরাদ্দ হয় ৪১.৫৪ টাকা মাত্র। সরকার কর্তৃক দলিতদের উন্নয়নে যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে জাতীয় বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ প্রদান অন্যতম প্রধান। সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক দলিত, হরিজন, বেদে উন্নয়ন নীতিমালা গ্রহণ করা হয়েছে এবং বরাদ্দকৃত প্রকল্প প্রায় ৪১টি জেলায় শিক্ষাবৃত্তি, যুব প্রশিক্ষণ ও বয়স্কভাতা প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

* জন-বাজেট সংসদ ২০১৮-এর আওতায় বাংলাদেশ দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী অধিকার আন্দোলন (বিডিইআরএম) ও নাগরিক উদ্যোগ আয়োজিত ইন্সটিটিউট অব এডুকেশন এন্ড রিসার্চ (আইইআর), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ মে ২০১৮ অনুষ্ঠিত প্রাক-বাজেট আলোচনা সভায় উপস্থাপিত নিবন্ধ

সারণি–১: বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ

অর্থ বছর	জেলা	বরাদ্ধকৃত অর্থ
২০১২–১৩	৭টি জেলা (ঢাকা, চট্টগ্রাম, নওগাঁ, দিনাজপুর, যশোর, বগুড়া পটুয়াখালী, এবং হবিগঞ্জ)	৬,৬০০,০০০ (ছেষট্টি লক্ষ টাকা) ৭৯,৬৯৮,০০০
২০১৩–১৪	২১টি জেলা (ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, শেরপুর, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, কুমিল্লা, পাবনা, নওগাঁ, দিনাজপুর, নীলফামারী, যশোর, কুষ্টিয়া, বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী এবং হবিগঞ্জ)	(সাত কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ আটানববই হাজার টাকা)
২০১৪–১৫	২১টি জেলা (ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, শেরপুর, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, কুমিল্লা, পাবনা, নওগাঁ, দিনাজপুর, নীলফামারী, যশোর, কুষ্টিয়া, বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী এবং হবিগঞ্জ)	৯২,২৯৪,০০০ টাকা (নয় কোটি, বাইশ লক্ষ, চুরানব্বই হাজার টাকা)
২০১৫–১৬	৬৪ জেলায়	১৮ কোটি (আঠার কোটি টাকা)
২০১৬–১৭	৬৪ জেলায়	২০৩,০০০,০০০ (বিশ কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা)
২০১৭–১৮	৬৪টি জেলায়	২৭০,০০০,০০০ (সাতাশ কোটি টাকা)

দলিত জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ে নিজস্ব কর্মসূচি ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ

দলিত জনগোষ্ঠীর জন্য কয়েকটি মন্ত্রণালয়ে নিজস্ব কর্মসূচিভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ হয়েছে। যেমন, শহরাঞ্চলের দলিত জনগোষ্ঠীর আবাসন ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ২০০৫ সালে বাংলাদেশ সরকার ঢাকা সিটি করপোরেশনের অধীন ধলপুর, সূত্রাপুর এবং দয়াগঞ্জে সুইপার কলোণী নির্মাণের জন্য ঢাকা সিটি করপোরেশনকে ২০ কোটি ৯৩ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়। দলিত আবাসনের উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কয়েকজন অসাধু ব্যক্তির ব্যাপক দুর্নীতির ফলে ঐ আবাসন প্রকল্পটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। (সূত্র: দৈনিক সমকাল, ১২ এপ্রিল, ২০১২)। পরবর্তীতে জাতীয় বাজেটের আবাসন খাতে দলিত, বেদে ও হিজড়া জনগোষ্ঠীর আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়নে ২০১১–১২ অর্থবছরে ১০ কোটি টাকা, ২০১২–১৩ অর্থবছরে ১৪ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা এবং ২০১৩–১৪ অর্থবছরে ১২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ২০১৪–১৫ অর্থবছরে উল্লেখিত জনগোষ্ঠীর আবাসন খাতে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়। সে অনুযায়ী ইতিমধ্যে ঢাকা শহরের বিভিন্ন কলোনিতে কিছু বহুতল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে এবং কিছু ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও গত ১ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় সরকার কনস্ট্রাকশন অব ক্লিনার কলোনি অব ঢাকা সিটি করপোরেশন এর প্রকল্পের আওতায় ঢাকা সিটি করপোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য ১ হাজার ১৪৮টি ফ্ল্যাট নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যার জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ১৯০ কোটি টাকা। ২০১৬–১৭ অর্থ বছরে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন ১,৭৭৩,০০০,০০০ (একশত সাতাত্তর কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা) আবাসন খাতে

বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বরিশাল সিটি করপোরেশনের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ২২,০০০,০০০ (বাইশ কোটি টাকা ৬ তলা বিশিষ্ট ৩টি আবাসন ভবন নির্মানের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয় প্রতিটি ভবনে ৪৮টি ফ্লাট আছে। বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী ঢাকা শহরের কলোনিগুলোতে বসবাসরত দলিত জনগোষ্ঠীর আবাসন সমস্য সমাধানে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ইতিমধ্যে বেশ কিছু ভবন নির্মাণ ও হস্তান্তর করা হয়েছে। (সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, ২ অক্টোবর ২০১৩ "একনেক-এর সিদ্ধান্ত"। আমরা দাবী করছি দলিত জনগোষ্ঠি এর সুফল পাবে এবং সঠিকভাবে ভবন হস্তান্তর করা হবে।)

প্রস্তাবনা

- সরকারি নীতিমালা এবং বাজেটে 'দলিত' শব্দটি বহাল রেখে দলিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করতে হবে। সংবিধান অনুযায়ী সকল মানুষকে সমান মর্যাদা প্রদান এবং সরকারি সকল নীতিমালায় দলিত ও বঞ্চিত সম্প্রদায়কে স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে; এবং বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় দলিত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম দলিত জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে সহায়তার জন্য বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখতে হবে।

- বাংলাদেশে দলিত জনগোষ্ঠীর প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য আদমশুমারীতে পৃথকভাবে চিহ্নিত করে গণনা করতে হবে। যাতে করে এই জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা যায়; সংখ্যানুপাতের ভিত্তিতে উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দ দিতে হবে। দলিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখতে হবে; দলিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদে সুনির্দিষ্টভাবে বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।

- প্রকৃত দলিতরাই যাতে বাজেটের বরাদ্দকৃত সুবিধা পায় সে জন্য সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায় থেকে আনুষ্ঠানিক নির্দেশনা প্রদান করা এবং একটি মনিটরিং-এর ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে; বিভিন্ন সরকারি সেবায় উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় দলিত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি রাখতে হবে।

- পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনে যাদের চাকুরী আছে বা নাই, এটা বিবেচনায় না নিয়ে সকলকে আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ দলিতদের সকলের চাকুরীর নিশ্চয়তা নাই এবং অস্পৃশ্যতার কারণে কলোনীর বাইরে তাদের বাড়ি ভাড়া পাওয়া সম্ভব নয়। এবং রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে পরিচ্ছন্নতার কাজে নিয়োজিত পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের চাকরি নিয়মিতকরণ ও বেতন-ভাতা বৃদ্ধির জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে।

জাতীয় বাজেট হোক আদিবাসীবান্ধব: আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রস্তাবনা ও সুপারিশ

'আদিবাসী মানুষ-পাহাড়-সমতল নির্বিশেষে নিরন্তর বঞ্চিত। পার্বত্য হোক আর সমতল হোক-আদিবাসী মানুষেরা মানুষ হিসাবে উন্নয়নের কোন মানদন্ডেই ভাল নেই। জমি-জলা-জঙ্গাল-এ আদিবাসী মানুষের মালিকানা বা অভিগম্যতা নেই (সামাজিক, প্রথাগত, ঐতিহ্যগত, গোষ্ঠীগত, ব্যক্তিগত)- এ মানদন্ডে আদিবাসী মানুষের হয়েছে অধোগতি। আর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, স্থানীয় উদ্যোগ, স্থানীয়-শাসন-কোন কিছুতেই তাদের এখন মূল ধারায় অর্ন্তভুক্ত করা যায়নি। ১৯৯৭ সালে (০২ ডিসেম্বর) 'শান্তিচুক্তি' খ্যাত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার প্রায় ২০ বছর পরেও এখনও পর্যন্ত পার্বত্য আদিবাসী মানুষের মধ্যে বঞ্চণা-বৈষম্য হ্রাসকারী জনকল্যাণকারী কোন স্থায়ী উন্নয়নের সুলক্ষণ প্রতিভাত হয়নি।'[১] আমরা দেখতে পাই, জাতীয় বাজেটের মধ্যেও সরকারের প্রতিশ্রুতি শুধু প্রতিশ্রুতি হিসেবেই রয়েছে। আদিবাসীদের মধ্যে নিরঙ্কুশ দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্যের হার যথাক্রমে ৬৫ শতাংশ ও ৪৪ শতাংশ। চরম দারিদ্র্য আদিবাসীদের কাজ খুঁজে পাবার সামর্থ্যও তাই কম, যা তাদের অবস্থাকে আরও করুণ করে তোলে। প্রস্তাবিত বাজেটে তাই আদিবাসী জনগণের জন্যে রাষ্ট্রের এবং সরকারের প্রতিশ্রুতি ও চুক্তিগুলোর আঙ্গিকে বাজেট প্রণয়ন করা উচিত। **অপরদিকে আদিবাসীদের পরিচয় সংকট ও সঠিক সংখ্যা নির্ধারণে জটিলতার ফলে আদিবাসী জনগোষ্ঠী বাজেটে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন**। ২০১১ সালে সরকারি হিসেবে আদিবাসীদের সংখ্যা ১৫,৮৬,২৩২ জন।[২] কিন্তু বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের দাবি, বাংলাদেশে ৩০ লক্ষাধিক আদিবাসী জনগণ বসবাস করেন[৩]।

আদিবাসীদের জন্য বাজেট বরাদ্দ বলতে আমরা সাধারণত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর আওতায় যে বরাদ্দকৃত অর্থ এবং সমতলের আদিবাসীদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে যে থোক বরাদ্দটুকু দেয়া হয় তাকেই বুঝে থাকি। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী ও অন্যান্যদের জন্য কিংবা এ অঞ্চলের অবস্থা পরিবর্তনে জাতীয় বরাদ্দ বাস্তবায়নে রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।[৪] আর সমতলের আদিবাসীদের দেখভাল করা ও তাদের উন্নয়নের বাজেট বাস্তবায়নে আজও কোন মন্ত্রণালয় বা অধিদপ্তর নেই।

পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন এবং এই অঞ্চলের জনসাধারণের সাংস্কৃতিক উন্নয়নসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের যথাযথ ব্যবস্থাদি গ্রহণের কথা রয়েছে। সর্বশেষ ২০১৭-২০১৮ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ের বাজেটে বরাদ্দ ছিল ১,১৫০ কোটি টাকা।

কিন্তু, বরাদ্দকৃত এই অর্থ শুধুমাত্র পার্বত্য এলাকায় বসবাসকারী আদিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য নয়। এই অঞ্চলে বসবাসকারী সেটেলার বাঙালি ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারি বাহিনীর উন্নয়ন খাতেও খরচ হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২০ বছর অতিবাহিত হয়ে গেলেও এ চুক্তি পূর্ণ বাস্তবায়নে সরকারের বার বার অঙ্গীকার থাকা সত্ত্বেও পর্যাপ্ত বরাদ্দ জাতীয় বাজেটে রাখা হয় না। জুম্ম শরনার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য 'টাস্কফোর্স' গঠিত হয়েছে, কিন্তু এ প্রতিষ্ঠানের জন্য ও পুনর্বাসন বাবদ জাতীয় বাজেটে আর্থিক বরাদ্দ নেই। পার্বত্য চুক্তির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হলেও এটি শক্তিশালীকরণে পর্যাপ্ত বরাদ্দ জাতীয় বাজেটে রাখা হয় না। তদুপরি, গতবছর লংগদুতে ২৫০টি বাড়িঘর পুড়ে নিঃস্ব অসহায় পাহাড়িদের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিতে সরকারি বরাদ্দ পাওয়া যায় না।

---

১ বারাকাত, আবুল। বাংলাদেশের কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি। ২০১৬। মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা। পৃ. ৮-৮২

২ পঞ্চম আদমশুমারি ২০১১

৩ বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, সংহতি (২০১৬), আদিবাসী শিক্ষা, ভূমি ও জীবনের অধিকার, পৃ.২০

৪ গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলন, ২০১৬। জনঅংশীদারিত্বের সন্ধানে, জাতীয় বাজেট (২০১৬-১৭). পৃ.২৬

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে বার্ষিক বরাদ্দ ২০০৯-১০ হতে ২০১৭-১৮॥
(অংকসমূহ কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	উন্নয়ন খাত	অনুন্নয়ন খাত	মোট বাজেট
২০০৯-১০	১৯৫	১৯৮	৩৯৩
২০১০-১১	৩৫৭	২০৮	৫৬৫
২০১১-১২	৩১৮	২৪২	৫৬০
২০১২-১৩	৪১৯	২৫১	৬৭০
২০১৩-১৪	৪৯৯	২৫৬	৭৫৫
২০১৪-১৫	৪৭৬	২৫৯	৭৩৫
২০১৫-১৬	৫১০	২৬৯	৭৭৯
২০১৬-১৭	৫৪৫	২৯৫	৮৪০
২০১৭-১৮	৮৪৯	৩০১	১১৫০

সূত্রঃ বাজেটের বিভিন্ন বছরের সংক্ষিপ্তসার

সমতলের আদিবাসীদের জন্য বরাদ্দ

সমতলের ২০ লক্ষাধিক আদিবাসীদের উন্নয়নে বাজেট বরাদ্দের কোন নির্দিষ্ট খাত/বিভাগ নেই। তাদের জন্য বরাদ্দ বলতে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে বাস্তবায়নাধীন Development Assistance for Special Area (except CHT) বা "বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা (পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত)"[5] শীর্ষক কর্মসূচিকে বুঝে থাকি। ২০০৯-১০ হতে ২০১৭-১৮ বিগত ৯টি অর্থ বছরে মোট ১৫৬.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচির মাধ্যমে সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। বিগত ৯ বছরের সমতলের আদিবাসীদের জন্যে অর্থাৎ ৬১ টি জেলার পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নয়ন বরাদ্দ মোটেই সঙ্গত নয়। সরকারি পরিসংখ্যানের মতে, হিসাব কষলে বিগত ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১ জন সমতলের আদিবাসীর জন্য গড়ে বাজেট হয় ৮০ থেকে ১০০ টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে তা দাঁড়ায় ১৫০ টাকায়। হিসেব কষলে, জাতীয় বাজেটে গড়ে প্রতিজনের জন্য বরাদ্দ যেখানে প্রায় ২৫,৬৯১ টাকা সেখানে পিছিয়েপড়া বঞ্চিত একজন সমতলের আদিবাসী প্রেষণামূলক বার্ষিক বরাদ্দ ১৫০ টাকা। একদিকে যেমন অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ আদিবাসী জনসংখ্যা অনুযায়ী খুবই কম আবার অন্যদিকে এ বরাদ্দকৃত অর্থ বন্টন প্রক্রিয়ার মধ্যেও রয়েছে নানা জটিলতা। বাজেট বাস্তবায়নে আদিবাসী প্রতিনিধিদের কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। আবার, প্রতি বছর সবগুলো উপজেলার আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে একসাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ এ বরাদ্দ প্রদান করা হয় না। ফলে, প্রকৃত আদিবাসী উপকারভোগী জনগণ এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে আদিবাসীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ

দুঃখের বিষয় হলেও সত্যি, বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা (পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত)-এ থোক বরাদ্দ ছাড়া আদিবাসীদের জীবনমান উন্নয়নে নির্দিষ্ট করে কোন কার্যক্রম বা বরাদ্দ এখানে চোখে পড়ে না। গত বছর সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় ৫৪,২৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। যেখানে আদিবাসীদের জন্য একটি থোক বরাদ্দ রয়েছে মাত্র ৩০ কোটি টাকার, যা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মোট বরাদ্দের মাত্র ০.০৫%। যার ফলে আদিবাসী পিছিয়ে পড়া মানুষ বাজেটের খাতভুক্ত বরাদ্দে বরাবরই অবহেলিত থেকে যাচ্ছে। সমতলের আদিবাসীদের জন্য বিগত ৩ অর্থ বছরে ১৬০টি উপজেলায় ৪০০টি আয়বর্ধনমূলক প্রকল্পে ৯.৮০ কোটি টাকা খরচ হয়। সমতলের সহজ সরল আদিবাসীরা

5 http://www.pmo.gov.bd/site/page/0c0d429d-1c42-4a82-905b-aaccf429d192/বিশেষ-এলাকার-জন্য-উন্নয়ন-সহায়তা-(পার্বত্য-চট্টগ্রাম-ব্যতীত)

সমতলের আদিবাসীদের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্দ ২০০৯-১০ হতে ২০১৭-১৮ (কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	মোট বাজেট
২০০৯-১০	৮
২০১০-১১	১৪
২০১১-১২	১৫
২০১২-১৩	১৭
২০১৩-১৪	১৬
২০১৪-১৫	১৬
২০১৫-১৬	২০
২০১৬-১৭	২০
২০১৭-১৮	৩০

সূত্রঃ গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচির এডিপি বরাদ্দের সংক্ষিপ্তসার

আমলাতন্ত্রের জটিলতার মধ্যে কতটুকু এই উপকার ভোগ করতে পেরেছে, তা সত্যিই ভাবার বিষয়। তাছাড়া সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর অন্যান্য কর্মসূচী যেমন: ভিজিএফ, ভিজিডি, এফএফই, কাবিখা, কাবিটা ইত্যাদিতেও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি খুবই কম।

মন্ত্রণালয়ভিত্তিক আদিবাসী বাজেট

পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ে (যেখানে আদিবাসীদের জন্য একটি অংশ বরাদ্দ থাকে) ১,১৫০ কোটি টাকা আর সমতলের জন্য মাত্র ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ আদিবাসীদের জন্য যথেষ্ট নয়। আবার সমতলের আদিবাসীদের জন্য বড় সমস্যা হলো তাদের উন্নয়নে বরাদ্দ বাস্তবায়নে সরাসরি কোন মন্ত্রণালয় বা খাত নেই। প্রধানমন্ত্রীর অধীনে একটি থোক বরাদ্দ রয়েছে যা বর্তমানে মাত্র ৩০ কোটি টাকা। হিসেব কষলে সমতলের একজন আদিবাসীর পৌঁছায় মাত্র ১৫০ টাকা। দীর্ঘ সময় থেকে বঞ্চিত হয়ে আসা সমতলের আদিবাসী কিংবা গোবিন্দগঞ্জের বাগদা ফার্ম থেকে উচ্ছেদকৃত হাজারো সাঁওতাল পরিবার যারা খোলা আকাশের নিচে বসবাস করছে তাদের কাছে এ বাজেট পৌঁছায় না। এটা দিয়ে সমতলের ২০ লক্ষাধিক মানুষের জীবনমান উন্নয়ন কোনভাবেই সম্ভব নয়। তার চেয়েও দুঃখজনক ব্যাপার হলো, এই অর্থ বাস্তবায়নে সমতলের আদিবাসীদের কোন অংশগ্রহণ বা ক্ষমতা নেই।

আদিবাসীদের অধিকার বাস্তবায়নে জাতীয় বাজেটে বরাদ্দের প্রস্তাবনা

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনে উন্নয়নের বিকাশ ঘটাতে হলে প্রয়োজন জাতীয় বাজেটে আদিবাসীদের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি ও বরাদ্দের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে আদিবাসীদের সম্পৃক্তকরণ। তখন খুব সহজে তারা দেশের মূল স্রোতের জনগণের সহিত সামনে অগ্রসর হবার সুযোগ পাবে এবং ক্রমান্বয়ে অনগ্রসরতা কাটিয়ে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারবে। আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য আগামী বাজেটে আমাদের প্রস্তাবনাসমূহ;

১. আদিবাসী জনগণের উন্নয়নের জন্য খাতভিত্তিক ও মন্ত্রণালয়ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে; সকল মন্ত্রণালয়ের/বিভাগের বাজেটে আদিবাসীদের জন্য সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ রাখা এবং বরাদ্দের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে আদিবাসীদের সম্পৃক্ত করতে হবে এবং এ বিষয়ে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে;

২. জাতীয় বাজেট বক্তৃতায় আদিবাসী বিষয়ে স্পষ্ট বিবরণী থাকতে হবে। আদিবাসী জনগণের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ এবং সংখ্যার ভিত্তিতে আদিবাসীদের বাজেট বৃদ্ধি করতে হবে; বাজেট বরাদ্দ সাধারণত হয় মন্ত্রণালয়ভিত্তিক। সংখ্যাগরিষ্ঠ আদিবাসীর বাস সমতলে। সমতলের আদিবাসীদের বিষয়টি দেখার জন্য এখনও কোনো মন্ত্রণালয় বা বিভাগ নেই। তাই, সমতলের আদিবাসীদের জন্য একটি পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করতে হবে; এজন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে;

৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ১৯৯৭ এর পূর্ণ বাস্তবায়নে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি-বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১-এর যথাযথ বাস্তবায়ন ও ভূমি কমিশনের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে বরাদ্দ রাখতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদসমূহের বাজেট বৃদ্ধি করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদের সুশাসন ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা শক্তিশালীকরণে পর্যাপ্ত বাজেট রাখতে হবে; জুম্ম শরনার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য 'টাস্কফোর্স' ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে জাতীয় বাজেটে পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ রাখতে হবে;

৪. আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক একাডেমিগুলোতে আদিবাসী সংস্কৃতি উন্নয়নে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। শুধু সঙ্গীত ও নৃত্য নয়, এ একাডেমিগুলোতে আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও গবেষণার জন্য বিশেষ বরাদ্দ রাখতে হবে;

৫. সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী ও সামাজিক ক্ষমতায়নের বাজেট খাতে আদিবাসীদের উন্নয়নে নির্দিষ্ট প্রকল্প/কার্যক্রম হাতে নিতে হবে এবং নিরাপত্তা বেষ্টনীর অন্যান্য কার্যক্রমেও তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে নির্দেশনা থাকতে হবে;

৬. উচ্চ শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষায় বৃত্তিসহ আদিবাসী নারী ও তরুণদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য বাজেট বরাদ্দ থাকতে হবে।

৭. আদিবাসীদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অন্তর্ভুক্তিমূলক জাতীয় বাজেট ২০১৮–১৯

উন্নয়নের মূল ধারায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হলে অপ্রতিবন্ধী মানুষের তুলনায় অতিরিক্ত বা সহায়ক ব্যয় বিবেচনায় আনা জরুরি যা নোবেল বিজয়ী ভারতের অমর্ত্য সেন 'Conversion handicap' নামে অভিহিত করেছেন।[১] প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের বাইরে রাখলে বাংলাদেশ হারায় প্রতি বছর জিডিপির শতকরা ১.৭ ভাগ ।[২] আমাদের জাতীয় বাজেটে শিক্ষা ব্যতিরেকে অন্যান্য ক্ষেত্র যেমন কর্মসংস্থান, বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিবন্ধীদের জন্য সরাসরি কোন উল্লেখ নাই। সর্বোপরি, বাজেটের আকার ও ক্ষেত্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বাড়ানো হলেও এখনও পর্যন্ত বরাদ্দের অর্থ গতানুগতিক কিছু ভাতা ও সুবিধার মধ্যে সীমিত রয়েছে। বাজেট বরাদ্দে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয়ে কোনো কর্মসূচি নাই।

নীচের লেখচিত্র অনুযায়ী, ২০১৩–১৪ থেকে ২০১৭–১৮ পর্যন্ত ৫ বছরের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য গৃহিত কার্যক্রমের বরাদ্দও এই খাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। ২০১৭–১৮ অর্থবছরে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বরাদ্দ

লেখচিত্র ১: সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বাজেট (কোটি টাকায়)

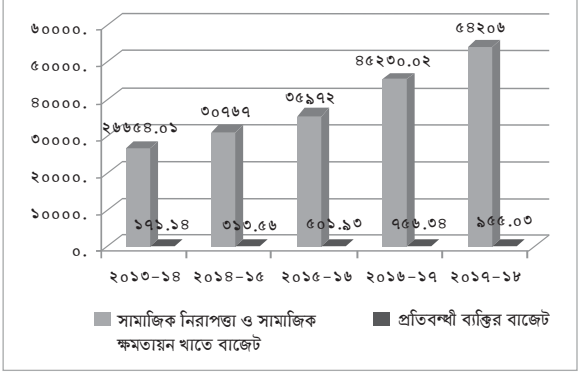

সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাতের বরাদ্দের মাত্র ১.৭৬%, যা বিগত ২০১৬–১৭ সালে ছিল ১.৬৭%, ২০১৫–১৬ সালে ছিল ১.৪%, ২০১৪–১৫ সালে ১.০৭% এবং ২০১৩–১৪ সালে ০.৬৪%। যদিও সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত বাজেট লাইনে এ সংক্রান্ত বরাদ্দ আনুপাতিকভাবে বছরওয়ারি বেড়েছে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চাহিদার তুলনায় তা খুবই অপ্রতুল।

বাজেটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চাহিদার প্রতিফলন ঘটাতে হলে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনা দরকার। অন্যকথায়, গতানুগতিক ধারায় কল্যাণমূলক বা সেবামূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে সামাজিক মডেল বিবেচনায় আনতে হবে। এছাড়া বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চাহিদা অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির চাহিদা থেকে যে আলাদা তা বিবেচনায় আনতে হবে। এইসব বিবেচনায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বান্ধব বাজেট প্রণয়ন তিনটি পূর্বশর্তের উপর ভিত্তিশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়। তা হলোঃ ১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার বিষয়ে বিদ্যমান আন্তর্জাতিক সনদ, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, দেশীয় আইন ও নীতিমালা অনুসরণ, ২. সামাজিক মডেল অনুসরণ, ৩. বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে দ্বি-স্তর ভিত্তিক অর্থায়ন (Twin Track Financing)। এই তিনটি পূর্ব শর্তের আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বান্ধব বাজেট সম্পর্কিত বিশেষ সুপারিশসমূহ প্রদত্ত হলো:

১. দেশে ৯০% প্রতিবন্ধী শিশু স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত[৩]। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষার আওতায় আনতে ও ঝরে পড়া রোধ করতে ২০১৮–১৯ অর্থ বছরে উপবৃত্তির সংখ্যা ও টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। উপবৃত্তি উপকারভোগীর সংখ্যা ৮০ হাজার থেকে ৩ লক্ষ করার সুপারিশ করছি।

২. শিক্ষায় প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে শিক্ষা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামো প্রবেশগম্য করা (র‍্যাম্প, লিফ্‌ট, প্রসস্ত দরজা ইত্যাদি), তথ্যগত

১ Sabri, AA (2017) Financing Inclusion? Pronounced Commitment, Un-dialoged Space …., a paper presented at the international conference on Inclusive Education held in Dhaka during January 13-15, 2017

২ World Disability Report 2011

৩ ইউনিসেফ এর দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক গবেষণা, ২০১৪

প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা (শিক্ষা সহায়ক উপকরণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগী করা যেমন- ব্রেইল বই, ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া টকিং বই, এক্সেসিব্‌ল ই-বুক ইত্যাদি), একীভূত শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, কারিকুলামে ইশারা ভাষা ও ব্রেইল পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করা এবং পাঠদান ও মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপযোগী করতে বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দের সুপারিশ করছি।

৩. বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাষার বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য বাংলা ইশারা ভাষা গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপনে বাজেটে বরাদ্দ রাখার সুপারিশ করছি।

৪. বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য সরকারি চাকুরিতে কোটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও তা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না। যা বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ প্রয়োজন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩-তে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বেসরকারিভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে কর রেয়াতের সুবিধার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং তা বাস্তবায়নে বাজেটে সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন। কর্মসংস্থানে বাধা দূর করতে কর্মক্ষেত্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগিকরণ অত্যাবশ্যক। আগামী বাজেটে এ বিষয়ে যথাযথ বরাদ্দের দাবি জানাচ্ছি। বেকার সমস্যা হ্রাস করতে প্রতিবন্ধী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে "আত্মকর্মসংস্থান অর্থায়ন তহবিল" গঠন করে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের সুপারিশ করছি।

৫. প্রতিবন্ধী নারীদের কর্মসংস্থানে সম্পৃক্ততা বাড়াতে কর্মজীবি মহিলা হোস্টেলগুলো প্রবেশগম্য করে অন্তত ১০% আসন প্রতিবন্ধী নারীদের জন্য সংরক্ষণ করতে বাজেট বরাদ্দের সুপারিশ করছি।

৬. ডিজিটাল বাংলাদেশের সেবায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করতে সকল ওয়েব সাইট, সরকারি ই-সার্ভিস, ইউনিয়ন তথ্য কেন্দ্র ইত্যাদি তাদের ব্যাবহার উপযোগী হওয়া উচিত। সুতরাং অবকাঠামোগত ও তথ্যগত প্রবেশগম্যতার জন্য ৪০০ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দের সুপারিশ করছি।

৭. বাংলাদেশে এ পর্যন্ত একটি বাসও নেই যেখানে হুইল চেয়ার ব্যবহারকারীরা ব্যবহার করতে পারে। তাই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যাতে পরিবহন সুবিধা পেতে পারে, এজন্য সকল বাস স্ট্যান্ড, নৌ টার্মিনাল, ট্রেনের প্ল্যাটফর্ম প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশগম্য করতে বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। একইসাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চলাচলের জন্য ঢাকা শহরে ৫ টি ও বিভাগীয় পর্যায়ে আরো ৭ টি প্রবেশগম্য বাস আমদানির জন্য বাজেটে যথাযথ বরাদ্দ ও বেসরকারি উদ্যোগে অন্তত ১০টি প্রবেশগম্য বাস আমদানির নির্দেশণা প্রত্যাশা করছি।

৮. সরকারের আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য স্থানচ্যুত, গৃহহীন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আবাসন এর ব্যবস্থা করে দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনের জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখা এবং কর্মজীবী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আবাসনের জন্য সরকারী ঋণ প্রদান প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা রাখার নির্দেশণা প্রদানের সুপারিশ করছি।

৯. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ও ক্রীড়া উন্নয়ন প্রসারের লক্ষ্যে আগামী অর্থবছরের বাজেটে বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ধরণ ও চাহিদা মোতাবেক মানসম্পন্ন সহায়ক উপকরণ দরিদ্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিনামূল্যে সরবরাহ করার জন্য বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১০. সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর উপখাতে বিভিন্ন তহবিল গঠনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ -তে উল্লিখিত ১১ প্রকারের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যাতে উপকৃত হতে পারে সেজন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন তহবিল গঠন করে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের সুপারিশ করছি।

১১. অতি গুরুতর প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবনযাত্রার ব্যয় তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। তাদের জন্য কেয়ার গিভারের প্রয়োজন হয়। এ বিষয় বিবেচনায় এনে অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাতা জনপ্রতি মাসিক ন্যূনতম ১৬০০ টাকায় উন্নীত করার জন্য সুপারিশ করছি।

১২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, সহিংসতা ও নির্যাতন হ্রাসকল্পে তৃণমূল পর্যায়ে ব্যাপক সচেতনতা কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এসকল কার্যক্রম প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন (ডিপিও) যেহেতু তৃণমূল পর্যায়ে সফলভাবে পরিচালনা করছে, সুতরাং এসকল কার্যক্রম আরো জোড়ালোভাবে পরিচালনার জন্য ডিপিও'দের জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের সুপারিশ করছি।

প্রণয়ন ও বিশ্লেষণ: আলবার্ট মোল্লা, নির্বাহী পরিচালক, অ্যাকসেস বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন

নোট

নোট

নোট

নোট

সহ-আয়োজক

Access Bangladesh Foundation

BDERM Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movement
বাংলাদেশ দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী অধিকার আন্দোলন

BILS

Bangladesh Adivasi Forum

FOR the WOMEN BY the WOMEN Forum
ফর দি উইমেন বাই দি উইমেন ফোরাম

গভার্নেন্স কোয়ালিশন
GOVERNANCE COALITION

Health Rights Movement National Committee

KAPAEENG Foundation

KHANI খানি
FOOD SECURITY NETWORK
BANGLADESH

কর্মজীবী নারী
KARMOJIBI NARI

LIFD

নাগরিক উদ্যোগ
NAGORIK UDDYOG
CITIZEN'S INITIATIVE

এসপিইডি

Safety & Rights
Promoting Safety, Enforcing Rights

UNA BANGLADESH

ওয়েভ ফাউন্ডেশন
WAVE FOUNDATION

তারুণ্যের বাজেট আন্দোলন

সহযোগী

actionaid